

সার-সংক্ষেপ

১. শিশু ও কিশোরদের সকল গ্রন্থির ও অন্যান্য অঙ্গের চিকিৎসার পথ ধরিয়ে দিতে পারলে শুধু যে তাদের শারীরিক বৃদ্ধিই হবে এমন নয় বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের দেহের সৌন্দর্য বাড়বে, অপরাধ প্রবনতাবোধও কমবে, জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তোলার মন-মানসিকতা অর্জন করবে এবং সমাজে সুনামের হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

২. দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল রোগের ক্ষেত্রে অধিকাংশ গ্রন্থিগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত থাকে। প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে গ্রন্থিগুলো অকেজো থাকে এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে গ্রন্থিগুলো অধিক কাজ করার ফলে নরম ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব গ্রন্থিগুলো এবং এরা যেসব অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের নিয়মিত আকুপেশার চিকিৎসা করে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৩. মানুষের ইচ্ছা শক্তি ও মানসিক অনেক সমস্যাই গ্রন্থিগুলোর সাথে সম্পর্কিত। এজন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যদি অমনোযোগী ও দুষ্ট ছাত্র/ছাত্রীদের উপর এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশের অপরাধ শাখা নতুন অপরাধীদের উপর এই চিকিৎসা চালান তবে খুব ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

৪. আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এক একটি যন্ত্র বিশেষ। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা এবং বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে কোনো অঙ্গে ক্লান্তি, অবসাদ বা বিকল অবস্থা সৃষ্টি হতেই পারে। এজন্য হাতের তালু ও পায়ের তালুর সবগুলো বিন্দুতে প্রতিদিন (প্রতিটি বিন্দুতে ৮-১০ বার এবং কোনো বিন্দুতে ব্যথা থাকলে ২০-২৫ বার) দশ মিনিট চাপ দিয়ে প্রতিটি অঙ্গ ও গ্রন্থিগুলোকে ব্যাটারি সেলের মতো রিচার্জ করতে

পারি । এতে করে সমস্ত অঙ্গ ও গ্রন্থিগুলো সার্ভিসিং হবে, সুখম ও সক্রিয় হয়ে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করবে এবং শরীর সুস্থ থাকবে ।

৫. কোনো বিন্দুতে ব্যথা থাকলেই চাপ দিয়ে বের করে দিন । এটাই হলো আকুপ্রেসারের মূলনীতি ।

৬. মুখেই আমরা ডায়াবেটিস-এর মতো মারাত্মক রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ।

৭. প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন অপর থেকে আলাদা, ঠিক তেমনি তাদের স্বাস্থ্যের প্রবণতা এবং সমস্যাও আলাদা । এজন্য খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে সুস্থ থাকা সম্ভব ।

৮. রোগের হাজারও নাম আছে কিন্তু প্রতিটি রোগই শরীরের কোনো না কোনো অঙ্গ বা গ্রন্থির সাথে সম্পর্কিত । সুতরাং অঙ্গ ও গ্রন্থিগুলোর বিন্দুগুলো চিকিৎসা করে প্রতিটি রোগেরই চিকিৎসা করা সম্ভব ।

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিসমূহ		
১.১	মানবদেহ	১৩
১.২	মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্র, তন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাদের কার্যবলি	১৪
১.৩	কংকালতন্ত্র	১৬
১.৪	স্নায়ুতন্ত্র	১৭
	(ক) মেরুদণ্ড	১৭
	(খ) মস্তিষ্ক	১৯
১.৫	পরিপাকতন্ত্র	২০
	(ক) মুখ	২০
	(খ) পাকস্থলী	২১
	(গ) ক্ষুদ্রান্ত্র	২১
	(ঘ) বৃহদন্ত্র	২১
	(ঙ) যকৃত	২২
	(চ) অগ্ন্যাশয়	২২
১.৬	সংবহনতন্ত্র	২৩
	(ক) রক্ত	২৩
	(খ) হৃৎপিণ্ড	২৩
১.৭	রেচনতন্ত্র	২৪
	(ক) কিডনি	২৪
	(খ) মূত্রাশয়	২৫
১.৮	সংবেদনশীল তন্ত্র	২৬
	(ক) ত্বক	২৬
	(খ) চোখ	২৬
	(গ) কান	২৭
	(ঘ) নাক	২৭
	(ঙ) জিহ্বা	২৮
১.৯	গ্রন্থিতন্ত্র	২৮
	(ক) বহিঃস্ফরা গ্রন্থি	২৮
	(খ) অন্তঃস্ফরা গ্রন্থি	২৮
	(গ) থাইমাস গ্রন্থি	২৯
	(ঘ) থাইরয়েড / প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থি	২৯
	(ঙ) যৌন ও পোস্টেট গ্রন্থি	৩০
	(চ) অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি	৩১
	(ছ) এড্রিনাল গ্রন্থি	৩১

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	(জ) পিটুইটারী গ্রন্থি	৩২
	(ঝ) পিনিয়াল গ্রন্থি	৩২
	(ঞ) লসিকা গ্রন্থি	৩৩
	দ্বিতীয় অধ্যায় : আকুপ্রেসার চিকিৎসার নিয়মাবলি ও বিন্দু পরিচয়	৩৫
২.১	আকুপ্রেসার চিকিৎসার নিয়মাবলি	
	(ক) আকুপ্রেসার চিকিৎসা কি?	৩৫
	(খ) আকুপ্রেসারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা	৩৫
	(গ) আকুপ্রেসার ও REFLEXOLOGY	৩৭
	(ঘ) ব্যথার প্রকৃতি	৩৭
	(ঙ) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা	৩৮
	(চ) চাপ দেয়ার পদ্ধতি	৩৮
	(ছ) কতক্ষণ চাপ দিতে হবে	৩৯
	(জ) কখন চাপ দিতে হবে	৩৯
	(ঝ) কতদিন চাপ দিতে হবে	৩৯
	(ঞ) প্রতিক্রিয়া	৪৯
	(ট) সতর্কতা	৪০
	(ঠ) বিনাযন্ত্রে চেক-আপ ও বিনা খরচে পরীক্ষা	৪০
	(ড) প্রয়োজনীয় যন্ত্র	৪১
	(ঢ) সেফা কাঠির ব্যবহার	৪২
২.২	বিন্দু পরিচয়	৪২
	(ক) আকুপ্রেসারের বিন্দুগুলোর অবস্থান	৪২
	(খ) শক্তি	৫০
	(গ) M.F. ও N.F.	৫০
	(ঘ) অস্ত্র গুচ্ছ কি?	৫১
	(ঙ) অস্ত্র গুচ্ছের পরীক্ষা	৫১
	(চ) অস্ত্র গুচ্ছ সরে গেলে কি হয়?	৫১
	(ছ) অস্ত্র গুচ্ছ পরীক্ষা ও ঠিক করার অন্যান্য পদ্ধতি	৫১
	(জ) সাইটিকা স্নায়ু	৫৩
	(ঝ) দাঁতের চিকিৎসা	৫৪
	(ঞ) চুলের যন্ত্রে আকুপ্রেসার	৫৫
	(ট) প্রতিটি বিন্দুর আলাদা আলাদা অবস্থান	৫৬
	তৃতীয় অধ্যায় : আকুপ্রেসারের সাহায্যে দেহের পরিচর্যা	৭১
৩.১	শিশুর পরিচর্যা	৭১
	(ক) গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা	৭১
	(খ) শূন্য থেকে আট বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের শিশুর পরিচর্যা	৭২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩.২	মহিলাদের পরিচর্যা	৭৩
	(ক) মাসিকের সমস্যা	৭৩
	(খ) শ্বেতপ্রদর	৭৪
	(গ) রজোঃ নিবৃত্তি	৭৪
	(ঘ) জরায়ুর সমস্যা	৭৪
	(ঙ) স্তনের সমস্যা	৭৫
৩.৩	পুরুষের পরিচর্যা	৭৫
	(ক) স্বপ্নদোষ	৭৬
	(খ) কম উত্তেজনা	৭৬
	(গ) ক্লিম্যাকটোরি	৭৬
৩.৪	নবদম্পতির পরিচর্যা	৭৬
৩.৫	বার্ধ্যক্য বয়সের পরিচর্যা	৭৬
৩.৬	দেহের তারুণ্য বজায় রাখা	৭৭
চতুর্থ অধ্যায় : সুস্থ থাকার উপায়		৭৮
৪.১	শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া	৭৮
	(ক) শ্বসন	৭৮
	(খ) বায়ু দূষণ ও শ্বসন জটিলতা	৭৯
	(গ) ফুসফুসের পরিচর্যা	৭৯
৪.২	হজম প্রণালী	৮১
	(ক) পাকস্থলী একটি চুলা	৮২
	(খ) পেটভর্তি হওয়ার ট্রাফিক সিগন্যাল	৮২
	(গ) শরীরের উপযোগী খাদ্য পরীক্ষা	৮৩
	(ঘ) পাকস্থলীর উত্তাপ কমে গেলে কি হয়?	৮৩
	(ঙ) পাকস্থলীর উত্তাপ বেড়ে গেলে কি হয়?	৮৪
	(চ) সুস্থতার জন্য চাই সুখম স্বাদের খাদ্য	৮৪
	(ছ) হজম শক্তি বৃদ্ধিতে করণীয়	৮৫
	(জ) হজম শক্তি বৃদ্ধি ও ভালো স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন সোজা হয়ে বসা	৮৬
	(ঝ) হজম শক্তি বৃদ্ধির ব্যায়াম	৮৬
	(ঞ) হজম শক্তি বৃদ্ধিতে আকুপেশার	৮৬
	(ট) দেহের প্রকৃতি	৮৭
	(ঠ) এলার্জি	৮৮
	(ড) শরীরের ভাষা	৮৯
	(ঢ) দেহের অতিরিক্ত তাপ বের করে দেয়ার উপায়	৯০
	(ণ) সবুজ রস	৯০
	(ত) স্বাস্থ্যকর পানীয় / স্বাস্থ্যকর চূর্ণ	৯১
	(থ) কালো চা তৈরির উপায়	৯১
পঞ্চম অধ্যায় : কতিপয় রোগের চিকিৎসা		৯২
৫.১	কতিপয় রোগের নাম, পরিচিতি ও চিকিৎসা	৯২

প্রথম অধ্যায়

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিসমূহ

১.১ মানবদেহ

মানবদেহ হলো আল্লাহ তায়ালা অসীম কুদরতের একটি নিদর্শন। মানবদেহকে একটি অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় কারখানার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আধুনিক যান্ত্রিক যুগের এমন কোনো যন্ত্র নাই যা আল্লাহ তায়ালা মানবদেহে রাখেন নি। দেহরূপী এ কারখানায় রয়েছে মস্তিষ্ক, যা শত শত কম্পিউটারের ক্ষমতাসম্পন্ন সুপার কম্পিউটার, দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে যোগাযোগের জন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং দূর-দূরান্তের তথ্য আদান-প্রদানের জন্য মোবাইল টাওয়ারের কাজ করে। বিস্ময়কর ক্যামেরা সাদৃশ্য দুটি চোখ, যা খুব নিকট হতে অসীম দূরের বস্তু দেখাতে সক্ষম। আশ্চর্যজনক অডিও রিসিভার সাদৃশ্য দুটি কান, যা কিনা প্রত্যেক শব্দকে আলাদাভাবে সনাক্ত করতে পারে। বায়ু নিয়ন্ত্রক যন্ত্র সাদৃশ্য ফুসফুস, অবিরাম পাম্প সাদৃশ্য হৃদপিণ্ড এবং চমৎকার ছাঁকনি সাদৃশ্য কিডনি।

দেহরূপী এ কারখানায় আরও রয়েছে একটি চমৎকার রাসায়নিক গবেষণাগার সাদৃশ্য পরিপাকতন্ত্র যার মধ্যে রয়েছে পুষ্টি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা। আশ্চর্যের বিষয় হলো, দেহরূপী এই কারখানায় রয়েছে একটি অনুপম প্রজনন ব্যবস্থা, যার সাহায্যে অনুরূপ একটি কারখানারূপী দেহ উৎপাদন সম্ভব। কারখানারূপী এ দেহের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার জন্য রয়েছে কতকগুলো গ্রন্থি।

আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বড় কুদরত হলো যন্ত্ররূপী এসব অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরস্পরের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দেহের মধ্যে এমন একটি ব্যবস্থা

রেখেছেন যার দ্বারা এ যন্ত্র সাদৃশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর দেখাশুনা করা যায়, প্রয়োজনে মেরামতও করা যায়। আল্লাহ্ তায়ালা এই কুদরতি ব্যবস্থার উপযোগী চিকিৎসা পদ্ধতি হলো আকুপ্রেসার।

দেহরূপী এ কারখানাটি কতকগুলো ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিট অনেকগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি ইউনিট এক একটি তন্ত্র নামে পরিচিত।

১.২ মানব দেহের বিভিন্ন তন্ত্র, তন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাদের কার্যাবলি :

ক্রঃ নং	তন্ত্রসমূহ	অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	কার্যাবলি
১.	কঙ্কালতন্ত্র	সকল অস্থি এবং তরুণাস্থি ইত্যাদি।	দেহের কাঠামো গঠন ও নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে ভারসাম্য রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে, অস্থি-সন্ধি গঠন, নড়াচড়ায় সাহায্য করে, রক্ত কণিকা উৎপাদন করে এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সঞ্চয় করে।
২.	স্নায়ুতন্ত্র	মস্তিষ্ক, সুষুমা-কান্ড (মেরুদণ্ড), সকল প্রান্তীয় স্নায়ু।	দক্ষ এবং সাধারণ দেহ সঞ্চালন পারিপার্শ্বিক খবরা খবর আদান-প্রদান দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম-ক্রিয়া নির্দেশ করে এবং সমন্বয় সাধন করে।
৩.	পেশীতন্ত্র	দেহের ওজনের ৪০ ভাগই পেশীকলা দ্বারা গঠিত। সকল ধরনের পেশী এর অন্তর্ভুক্ত।	গ্লাইকোজেন সঞ্চয় করে শক্তি উৎপাদন করে এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে। কঙ্কালের সাথে মিলে থেকে দেহের আকৃতি দান করে। আত্মরক্ষা ও তাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

ক্রঃ নং	তত্ত্বসমূহ	অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	কার্যাবলি
৪.	পরিপাকতত্ত্ব	মুখ, মুখ-গহ্বর, দাঁত অন্ন-নালী, পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত্র, উপাক্ষ, বৃহদন্ত্র এবং মলদার ।	খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য পরিপাক করা, পানি, লবণ- জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন ও পরিপাককৃত খাদ্যাংশ শোষণ এবং অপাচ্য অংশকে মল হিসেবে ত্যাগ ।
৫.	সংবহন তত্ত্ব	রক্ত, হৃৎপিণ্ড, ধমনী শিরা, কৈশিক নালী ।	দেহের প্রতিটি কোষে খাদ্যের ও ভিটামিন পরিবাহিত করা । অক্সিজেন সরবরাহ করা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া । হরমোন ও এনজাইম দেহের প্রয়োজনীয় অংশে পৌঁছে দেয়া । দেহের প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষা মূলক কাজে অংশ নেওয়া ।
৬.	শ্বসনতত্ত্ব	দুটি নাসারক্ত, ফুসফুস শ্বাসনালী ।	অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন করে । কিছু উদ্বায়ী পদার্থ যেমন অ্যামোনিয়া অ্যালকোহল, জলীয়বাষ্প যা দেহের জন্য ক্ষতিকর দেহ থেকে নির্গত করে অম্ল ক্ষারের সমতা রক্ষা করে এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ।
৭.	রেচনতত্ত্ব	কিডনি, মূত্রনালী, মূত্রথলি এবং ইউরেটার ।	দেহ থেকে ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ বহিষ্কার করে । রক্ত ও দেহে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে ।

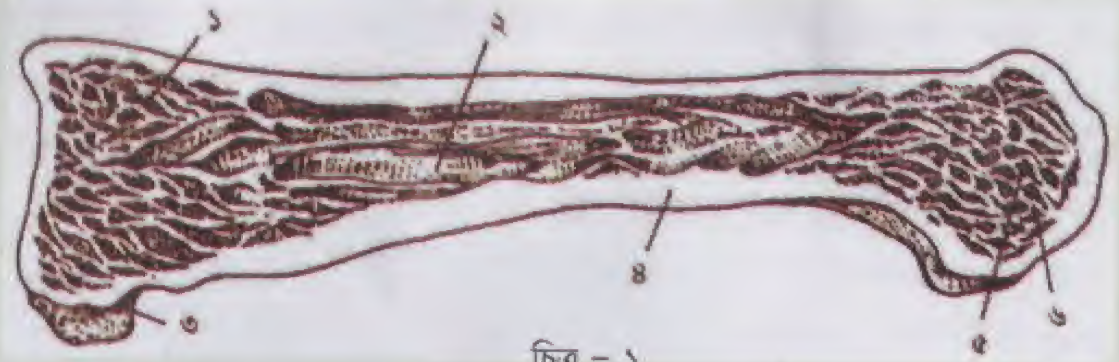
ক্রঃ নং	তন্ত্রসমূহ	অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	কার্যাবলি
			কিডনি রেনিন নামক এনজাইম ক্ষরণ করে রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
৮.	সংবেদনশীল তন্ত্র/পঞ্চ ইন্দ্রিয়	ত্বক, চোখ, কান নাক, জিহ্বা।	বহিরাঘাত থেকে ত্বকের নিচে অবস্থিত অঙ্গাদিকে রক্ষা করে, দেহের তাপমাত্রার সমতা রক্ষা করে এবং স্পর্শ, চাপ, ব্যথা, উষ্ণতা ও শৈত্য প্রভৃতি সাধারণ সংবেদন অনুভব করে।
৯.	গ্রন্থি তন্ত্র	বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ	বহিঃক্ষরা এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন করে এবং দেহের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করে।
১০	প্রজনন তন্ত্র	স্ত্রী : ডিম্বাশয়, ডিম্বাণু, ডিম্বনালী, জরায়ু, জনন অঙ্গ ও স্তন গ্রন্থি পুরুষ : শুক্রাশয়, শুক্রাণু, পোস্টেট গ্রন্থি এবং বাহ্যিক জননেন্দ্রিয়	নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি করে। জনন কোষ উৎপাদন, স্থানান্তর ও এদের মিলন ঘটায়। নিষিক্ত ডিম্বাণুর পর্যায় ক্রমিক বৃদ্ধি ঘটায় কিছু কিছু হরমোন ক্ষরণ করে দেহের বৃদ্ধি ও বিপাকে অংশ নেয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

১.৩ কঙ্কাল তন্ত্র

কঙ্কাল : মানবদেহ বিভিন্ন আকারের মোট ২০৬টি অস্থি নিয়ে গঠিত। মাথার করোটিকা অস্থি মস্তিষ্কে আবৃত ও সংরক্ষিত করে। মেরুদণ্ডের অস্থিসমূহ, সাইটিকা নার্ভ (সুষুম্নাকাণ্ড)-এর সুরক্ষা করে। বক্ষপিঞ্জর অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ অংগ হৃৎপিণ্ড ফুসফুস প্রভৃতিকে সুরক্ষিত করে। হাত পায়ের অস্থি চলনে সহায়তা করে।



চিত্র - ১

১। ৩, ৫ ও ৬ : অস্থির দুই প্রান্তের নলাকার কাঠামো।

২। ১ ও ২ ভিতরের অস্থিমজ্জা।

৩। ৪ ভিতরের শূন্য গর্ত।

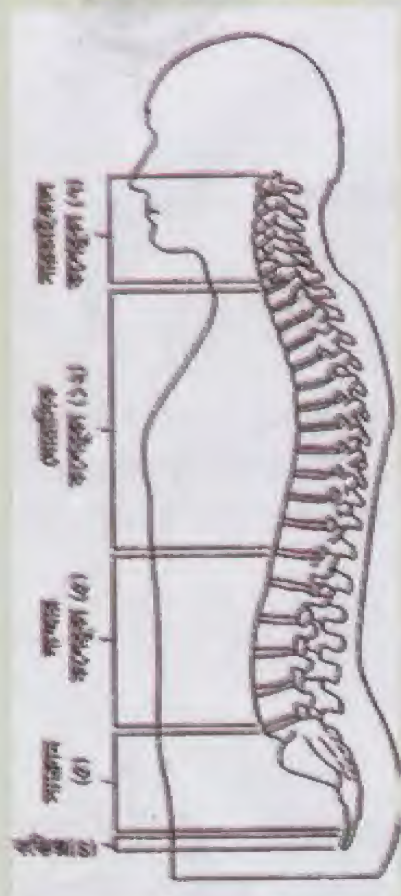
অস্থির ভিতর অস্থিমজ্জা থাকে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ নতুন লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয়। যখন অস্থি মজ্জা বিকল হয়ে যায় তখন লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদন কমে যায় এবং দূষিত আবর্তের ফলে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়। তখন রোগী ব্লাড ক্যান্সারে ভোগেন।

১.৪ স্নায়ু-তন্ত্র

(ক) মেরুদণ্ড (বিন্দু নং-৯)

মেরুদণ্ডকে সাধারণত শিরদাঁড়া (স্পাইনাল কলাম) নামে অবিহিত করা হয়। ৩৩টি অনিয়ত আকৃতির অস্থি খন্ড নিয়ে মেরুদণ্ড গঠিত। উপরের ৭টি অস্থি খণ্ড হলো গ্রীবদেশীয় কশেরুকা (ঘাড়), তারপর ১২টি অস্থিখণ্ড হল বক্ষদেশীয় কশেরুকা (পিঠ), তারপর ৫টি অস্থিখণ্ড হল কটিদেশীয় কশেরুকা, তারপর একত্রিভূত ৫টি অস্থিখণ্ড হল শেনি দেশীয় কশেরুকা এবং সর্বশেষে একত্রিভূত ৪টি কশেরুকা হলো পুচ্ছদেশীয় কশেরুকা মেরুদণ্ড থেকে কতকগুলো স্বল্প দৈর্ঘ্যের সাইটিকা স্নায়ু বের হয়ে শরীরের সামনের ও পিছনের দিকে বিভিন্ন ক্রিয়াশীল অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে। মেরুদণ্ডের কোনো সমস্যা দেখা দিলে শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা হয়। যেমন—

- (i) মেরুদণ্ডের গ্রীবা দেশীয় ৪ ও ৫নং অস্থিসন্ধি অবদমিত হলে তৌতলামী হয়। এই সন্ধিতে চিকিৎসা করা হলে তৌতলামী সেরে যায়।
- (ii) ঠাণ্ডা লাগার জন্য মেরুদণ্ডের বক্ষদেশীয় ৬ ও ৮ নং অস্থি সন্ধির সাইটিকা স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে হুথপিণ্ডে চার দিকের পেশীতে যন্ত্রণা সঞ্চারিত হয়। এক্স-রেতে এ সমস্যা ধরা পড়ে না। অনেক সময় একে হুথপিণ্ডের সমস্যা মনে করে ভুল করা হয়।



চিত্র -২



চিত্র -৩

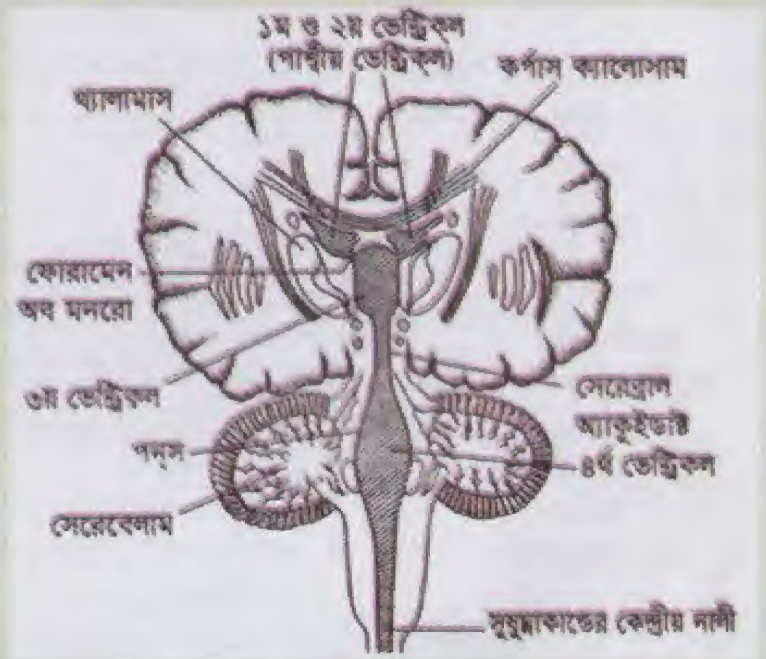
এজন্য সাইটিকা নার্স ঠিকমত কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য নিয়মিত নিম্নের ব্যায়াম এবং সোজা হয়ে বসা খুব প্রয়োজন।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দুই পা ১২ ইঞ্চি থেকে ১৫ ইঞ্চি ফাঁক করে সোজাভাবে দাড়ান। পিছনের দিকে যতটা সম্ভব হেলে পড়ে দু'হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে শ্বাস গ্রহণ করুন। দুই পা সোজা রেখে কোমর থেকে উপরের অংশ সামনে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে মাটি স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে কোমরের নিচের অংশ সোজা থাকবে। প্রথম

প্রথম মাটি স্পর্শ করতে নাও সম্ভব হতে পারে নিয়মিত অনুশীলন করলে পায়ের পিছনের মাটি ও স্পর্শ করতে পারবেন ।

(খ) মস্তিষ্ক বিন্দু (১-৫) :

করোটির মধ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্থিত অংশ হলো মস্তিষ্ক । মস্তিষ্ক নিরোট নয় । এর মধ্যে বিভিন্ন ফাকা প্রকোষ্ঠের মত থাকে । এ প্রকোষ্ঠকে ভেন্ট্রিকল বলে । এগুলোকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভেন্ট্রিকল নামে অভিহিত করা হয় । ভেন্ট্রিকলগুলো স্পাইনাল ফ্লুইড নামক তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে । প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ১৫০০ ঘন সেন্টি মিটার এবং ওজন ১.৩৬ কেজি প্রায় । এটি একটি স্বয়ংক্রিয় পারমানবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র । এতে প্রায় ১০ বিলিয়ন (১ হাজার কোটি) নিউরন বা স্নায়ু কোষ থাকে । রক্ত যখন এর মধ্যে দিয়া সঞ্চালিত হয় তখন জৈব বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় । এই

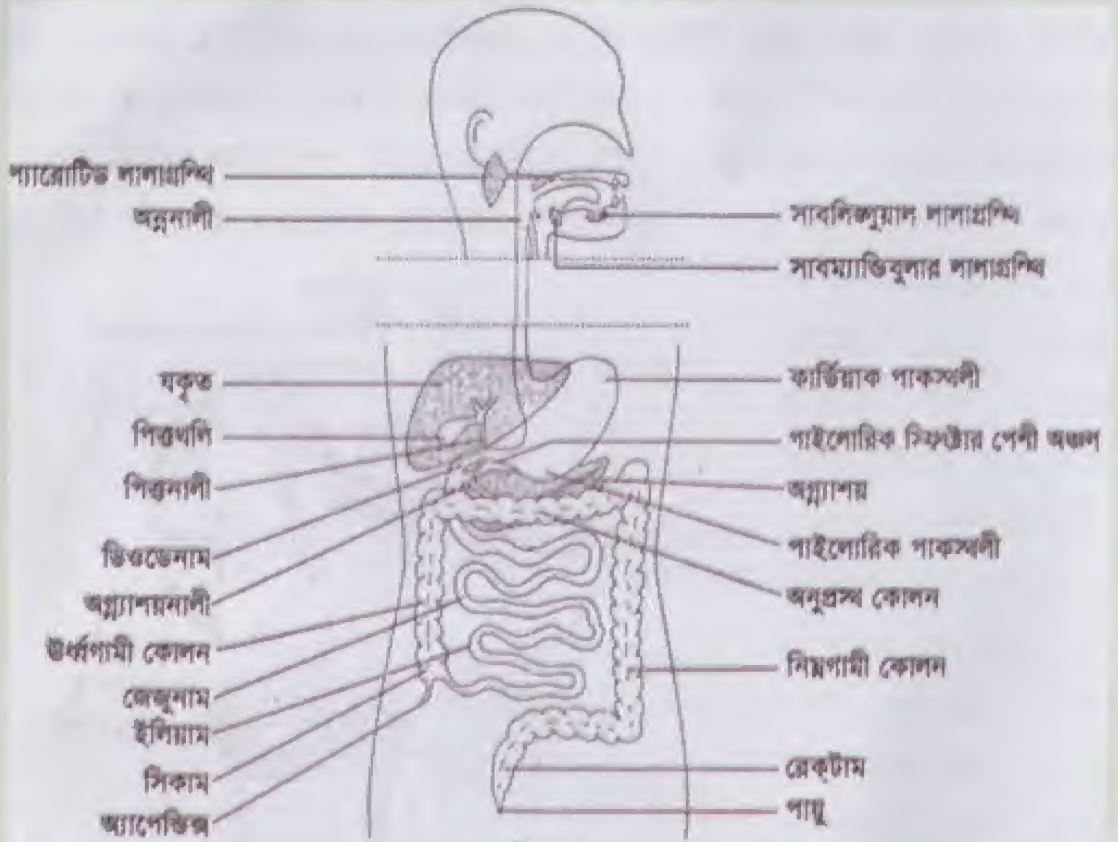


চিত্র - ৪

বিদ্যুতের ধনাত্মক প্রবাহ মস্তিষ্কের প্রথম ভেন্ট্রিকল দ্বারা প্রবাহিত হয় এবং ঋণাত্মক প্রবাহ দ্বিতীয় ভেন্ট্রিকল দ্বারা প্রবাহিত হয় । ফলে স্নায়ু কোষগুলো উত্তেজিত ও সক্রিয় হয়ে দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য সম্পাদন করে এবং দেহে প্রান শক্তি সঞ্চালিত করে । রক্তে লবনের মাত্রা বেড়ে গেলে অথবা দূষিত্তার কারণে নিউরন কোষগুলো শক্ত হয়ে যায় । ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত মস্তিষ্কে পৌছাতে অতিরিক্ত চাপের প্রয়োজন হয় । এই অতিরিক্ত চাপই হলো উচ্চ রক্ত চাপ । উচ্চ রক্ত চাপের সাথে যদি মানসিক দূষিত্তা যোগ হয়, তখন চুলের মতো সূক্ষ্ম স্নায়ু কোষগুলো ছিঁড়ে যায় । ফলে ব্রেইন স্ট্রোক হয় ।

১.৫ পরিপাক তন্ত্র

পরিপাক তন্ত্র হল শরীরে পুষ্টি উৎপাদন ও ময়লা নিষ্কাশনের এক চমৎকার রাসায়নিক কারখানা। এটি পরিপাক নালী ও পরিপাক গ্রন্থিগুলো নিয়ে গঠিত। সংক্ষেপে পরিপাক তন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের বর্ণনা দেয়া হলো।



চিত্র-৫

(ক) মুখ : এটি পরিপাক তন্ত্রের প্রবেশ দ্বার এবং পরিপাক নালীর শুরু। এর মধ্য দিয়ে সকল খাদ্য ও পানীয় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মুখ গহববর : মুখের মধ্যে ফাকা স্থান হলো মুখ গহববর। একে ঘিরে আছে গাল, দাঁত, মাড়ি, জিহ্বা, তালু, লালগ্রন্থি এবং গলনালী ইত্যাদি। মুখ গহববরে অবস্থিত :

- দাঁত খাদ্য দ্রব্যকে কাঁটা ছেঁড়া ও পেষণে অংশগ্রহণ করে।
- জিহ্বা খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করে, খাদ্য পেষণের সময় লাল রস মিশ্রিত করে এবং গলাধকরণের জন্য পিছনে ঠেলে দেয়।
- লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লাল রস খাদ্যের সাথে মিশে খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এবং শর্করা জাতীয় (Glucose) খাদ্যকে হজমে সহায়তা করে।

এজন্য প্রতি গ্রাস খাদ্য গ্রহণের সময় ১০ থেকে ১২ বার চিবানো উচিত এবং এ সময় যতটা সম্ভব কথা না বলা উত্তম ।

(খ) **পাকস্থলী (বিন্দু-২৭) :** এটি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো অংশ । পাকস্থলীর প্রাচীরে রয়েছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি । একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের পাকস্থলীর প্রায় ৪০ মিলিয়ন (৪কোটি) গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে । প্রতিদিন এটি হতে প্রায় দু' লিটার গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ হয় । পাকস্থলীতে খাদ্যবাহিত ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কোনো জীবাণু নষ্ট হয় এবং প্রোটিন এবং স্নেহজাতীয় (তৈল) খাদ্যের হজম ক্রিয়া এখান থেকে শুরু হয় । খাদ্যবস্তু বিভিন্ন পাচক রসের মিশ্রণ ও মিশ্রণ ক্রিয়া প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে । পাকস্থলী কর্মক্ষমতা পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার জন্য এর উপর কখনও অতিরিক্ত খাদ্যের খাদ্যের চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয় এবং দুই আহারের মধ্যে বার বার খাওয়া ঠিক নয় । পাকস্থলী একটি যন্ত্র, এরও বিশ্রামের প্রয়োজন এজন্য রাতে একে ৯-১০ ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন । বিজ্ঞ হেকিমদের মতে ক্ষুধার উদ্বেক হলেই খানা খাওয়া এবং কিছুটা ক্ষুধা থাকতেই খানা বন্ধ করলে রোগ মুক্ত থাকা যাবে ।

(গ) **ক্ষুদ্রান্ত্র (বিন্দু-১৯) :** এটি প্রায় ৬-৭ মিটার লম্বা । ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা ডিউডেনাম (২৫-৩০সে. মি. লম্বা); জেজুনা (আড়াই মিটার লম্বা); ইলিয়াম (ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রায় তিন পঞ্চমাংশ) এর নিজস্ব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পাচক রস এবং পিত্তশয় থেকে নিঃসৃত পিত্ত ও অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত পাচক রসের সহায়তায় শর্করা, প্রোটিন এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখে । অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশে সম্পন্ন হয় এবং পরিপাকের পর খাদ্য সার, রক্ত বাহিকা এবং লসিকা বাহিকায় শোষিত হয় ।

(ঘ) **বৃহদান্ত্র :** সিকাম থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় দু'মিটার লম্বা অংশ । এর তিনটি অংশ সিকাম, কোলন ও মলাশয় । সিকাম ও কোলনের ভিতর ব্যাকটেরিয়া ও এককোষী প্রাণির কর্মকাণ্ডে উদ্ভিদ-তন্ত্রের সেলুলোজ ও হেমিসেলুলোজ প্রবৃত্তি দুঃপ্রাচ্য পলি স্যাকারাইড ভেঙে ক্ষুদ্র ফ্যাটি এসিড অনু উৎপন্ন করে । সিকাম থেকে নির্গত প্রায় ১০ সেন্টিমিটার লম্বা বর্ধিত

অংশকে উপাঙ্গ (Apen-dix বিন্দু : ২১) বলে। এর বিশেষ কোনো কার্যকারিতা নাই। কিন্তু এর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে অথবা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে এটি ক্ষীত হয় এবং পেটে ডান পার্শ্বে ব্যথা হয় সেই সাথে বমিও হতে পারে। আকুপ্রেসার চিকিৎসার মাধ্যমে অপারেশান ছাড়াই চিকিৎসা করা যায়।

হজম ক্রিয়া যদি ঠিক থাকে তবে মল হবে পরিষ্কার, নরম এবং প্রায় গন্ধহীন।

(ঙ) যকৃত (বিন্দু-২৩) : এটি উদর গহবরের উপর ভাগে ডানে ডায়াফ্রামের নিচে অবস্থিত। শরীরে উৎপন্ন তাপকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অধিক তাপ থেকে শরীরকে রক্ষা করে। যকৃতে উৎপন্ন পিত্তরস পিত্তথলিতে (বিন্দু-২২) সংগৃহীত হয়। সেখান থেকে পরিমাণ মতো ডিউডেনামে আসে এবং পাকস্থলীর থেকে আগত অর্ধ পরিপাককৃত অম্লীয় তরল খাদ্য ক্ষারীয় পদার্থে পরিণত হয়। যকৃত যদি যথেষ্ট পরিমাণ পিত্ত রস উৎপন্ন না করে অথবা পিত্তথলি থেকে প্রয়োজন মতো পিত্তরস ডিউডেনামে না আসে তাহলে :

১। হজম ক্রিয়ার অম্লতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অধিক বায়ু উৎপন্ন হয়, পেটে শব্দ হয়, পেট ও অন্ননালী জ্বলে, মুখে ও অস্ত্রে ঘা হয় এবং দাঁত ও মাড়ির শক্তি কমতে থাকে।

২। শরীরে অধিক তাপ উৎপন্ন হয়। ফলে ঘন ঘন সর্দি হয় এবং চোখের শক্তি কমে যায়। পুরুষের বীর্য রস পাতলা হয় সে কারণে ঘন ঘন স্বপ্ন দোষ হয় এবং শীঘ্রই বীর্য স্থলন হয়। স্ত্রী লোকদের ডিম্বরস পাতলা হয় সে কারণে লিউকোরিয়ায় ভোগেন।

৩। জন্ডিস, চর্মরোগ ও চুলকানী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই প্রকার মানুষগুলো রাগী ও খিটখিটে স্বভাবের হয়।

(চ) অগ্ন্যাশয় (বিন্দু-২৫) : এটি উদার গহবরে পাকস্থলীর নিচে এবং ডিউডেনাম থেকে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত পাতার মত অনিয়ত আকার বিশিষ্ট গোলাপি রংয়ের গ্রন্থি। অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রন্থি। এই গ্রন্থিটি যে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণ করে তাতে কার্বো হাইড্রেট (শর্করা); প্রোটিন ও ফ্যাট

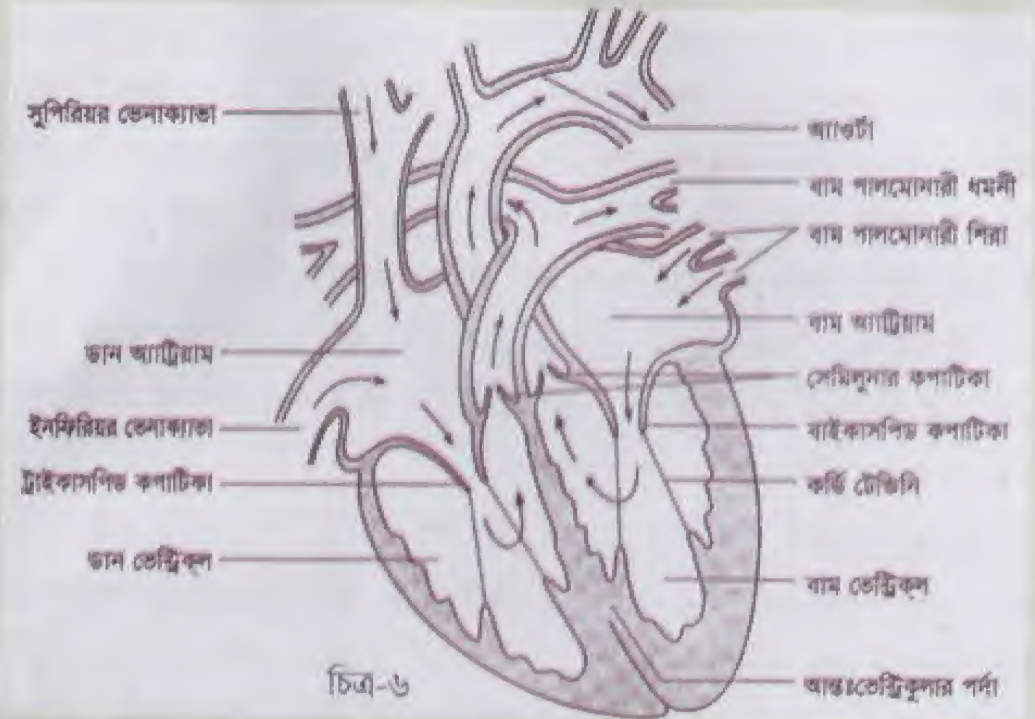
জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের জন্য বিভিন্ন এনজাইম থাকে। সুতরাং এটি একটি পরিপাক গ্রন্থি। আবার রক্তে শর্করার সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন নামক হরমোন উৎপন্ন করে। সুতরাং এটি একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। এ গ্রন্থি অধিক সক্রিয় হলে মিষ্টি খাওয়ার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য পানের আকাঙ্ক্ষা জাগে ফলে রক্ত চাপ কমে যাওয়া বা মাথা ব্যথা (Migraine Headache) হতে পারে। আমি কয়েকজন ধূমপায়ীকে পরীক্ষা করে দেখেছি তাদের অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি অধিক সক্রিয়।

১.৬ সংবহন তন্ত্র :

রক্ত, রক্ত বাহীনালী ও হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই তন্ত্রটি গঠিত।

(ক) রক্ত : ক্ষুদ্রাত্ত্ব দ্বারা শোষিত খাদ্য সার থেকে প্লিহা রক্ত তৈরি করে হৃৎপিণ্ডে পৌছে দেয়। রক্তের প্রধান উপাদান রক্ত রস ও রক্ত কণিকা। রক্তের প্রায় ৫৫% রক্তরস। এই রক্তরসের ৯২% পানি। পরিপাকের পর খাদ্য সার এর অধিকাংশ জৈব অজৈব পদার্থ রক্ত রসের পানিতে দ্রবীভূত হয়ে দেহের প্রতিটি কোষে পৌছে দেয় এবং বিভিন্ন গ্রন্থিতে উৎপন্ন হরমোন ও এনজাইম নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেয়। আবার রক্ত কণিকা ফুসফুস হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে প্রতিটি কোষে পৌছে দেয় অন্যদিকে কোষের মধ্যে এদের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ইউরিয়া; ইউরিক এসিড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি কিডনি ও ফুসফুসের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে।

(খ) হৃৎপিণ্ড : বক্ষ গহবরে মধ্যচ্ছদার উপরে এবং দুই ফুসফুসের মাঝ বরাবর বাম দিকে একটু বেশি বাকা হয়ে হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে (চিত্র-৬)। একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় ৩০০ গ্রাম। পূর্ণ বয়স্ক মহিলার হৃৎপিণ্ডের ওজন পুরুষের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম। জীবন্ত এই পাম্পটি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে অবিশুদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে গ্রহণ করে ফুসফুসে প্রেরণ করে এবং ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে ধমনীর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে। পূর্ণ বয়স্ক একজন শারীরিক পরিশ্রমী মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৫০ থেকে ৬০ বার সংকোচন ও



চিত্র-৬

প্রসারণ ঘটে। পক্ষান্তরে নিষ্ক্রিয় মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৭০ থেকে ৭৫ বার সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে। যার ফলে নিষ্ক্রিয় মানুষের হৃৎপিণ্ডের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং এদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি থাকে। নিয়মিত হাটা, সাঁতার কাঁটা ও ব্যায়াম ইত্যাদি করলে এই সম্ভাবনা কমে যায়।

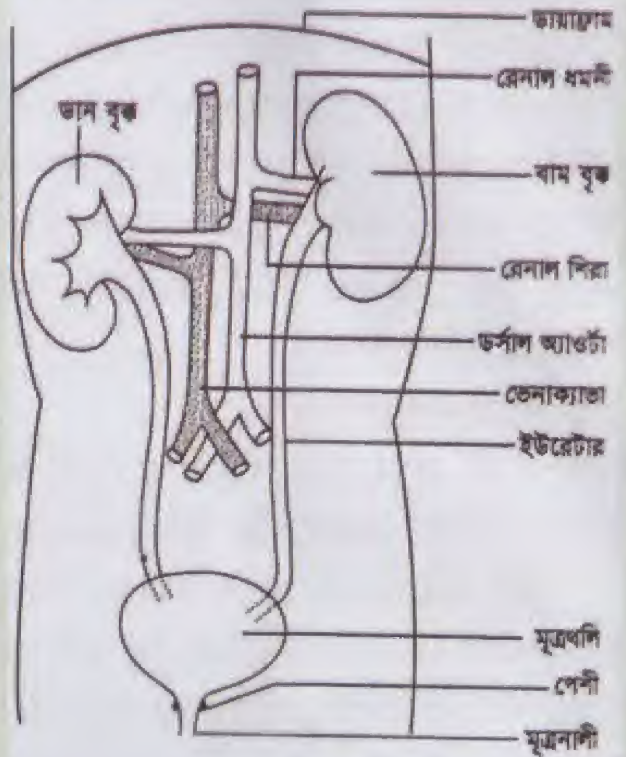
১.৭ রেনাল তন্ত্র :

কিডনি, ইউরেটার, মূত্রনালী ও মূত্রথলির সমন্বয়ে এই তন্ত্রটি গঠিত।

(ক) কিডনি (বিন্দু নং ২৬) : উদর গহবরের পিছনে বক্ষপিঞ্জরের নিচে ও মেরুদণ্ডের দু'পাশে দুটি কিডনি থাকে (চিত্র-৭)। দেহের বিভিন্ন কোষে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বিষাক্ত নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব উৎপন্ন হয়ে রক্তের সাথে মিশে যায়। কিডনি এই বিষাক্ত পদার্থ যুক্ত রক্তকে ছেকে পরিশোধিত করে। প্রতিদিন কিডনি ১৭৫ লিটার রক্ত ছেকে পরিষ্কার করে এবং লিটারের মত অপ্রয়োজনীয় বস্তুপ্রস্রাবের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়। কিডনির যে কোনো রকমের সমস্যায় ২৬নং বিন্দুতে ব্যথা হয়।

যে কোনো কারণে ফুসফুসে কার্যক্রম যদি ব্যাহত হয় তখন রক্তে কার্বন জাতীয় বিষাক্ত পদার্থের মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং কিডনিকে অধিক কাজ করতে হয়। এক সময় কিডনি বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশন ক্ষমতা কমে যায়।

আবার যখন থাইরয়েড/প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যক্রম ব্যহত হয় তখন ক্যালসিয়াম সঠিকভাবে হজম হয় না। ফলে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। এই ক্যালসিয়াম শরীর থেকে প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়, ফলে হাঁটু কোমর ও অন্যান্য অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়। ক্যালসিয়াম কিডনির মধ্যে দিয়া অতিক্রম করার সময় কিডনিতে জমতে থাকে এক সময় পাথরে পরিণত হয়।



চিত্র-৭

কিডনি রোগের মূলে অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে যৌন রোগ। অর্থাৎ পুরুষের পোস্টেড গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত এবং মহিলাদের জরায়ু রোগের কারণে কিডনিতে সমস্যা দেখা দেয়। কিডনি রোগীদের জন্য কালো চা পান করা বিশেষ উপকারী। কালো চা-এর বর্ণনা পরে আসছে।

(খ) মূত্রাশয় (বিন্দু-১৮) : দেহের শ্রেণি-গহ্বরের অবস্থিত স্থিতিস্থাপক ও পেশীবহুল ত্রিকোণা মূত্রথলি মূত্রভাগার হিসাবে কাজ করে এর মূত্র ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪৫০ মি.লি.-এর বেশি হলেই যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা জাগে। মূত্রের উপাদানের মধ্যে পানিই সর্বাধিক, শতকরা ৯৫ ভাগ। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও বিভিন্ন লবণ ইত্যাদি। মূত্র মূলত এসিডিক। মূত্রের পরিমাণ পানি গ্রহণের পরিমাণ, খাদ্যের ধরন ও তাপমাত্রা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে যেমন খাদ্যে তরলের পরিমাণ বেশি থাকলে মূত্রের মাত্রা বেড়ে যায়, আবার বেশি ঘামলে মূত্রের মাত্রা কমে যায়। আবার চা, কফি, পানি ইত্যাদি মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয়।

শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় কম পানি গ্রহণ করলে বা রক্তে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য পদার্থ বৃদ্ধি পেলে মূত্রের এসিডিটির মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মূত্রাশয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং তলপেট ব্যথা করে। এ অবস্থায় অতিরিক্ত প্রস্রাব, স্বল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবের পথে জ্বালা, প্রস্রাব হলুদ বর্ণ হওয়া, প্রস্রাব আটকে আসা, প্রস্রাবের বেগ ধরে রাখতে না পারা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। অনেক সময় কিডনি ও যৌন গ্রন্থির সমস্যার কারণে এসব অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।

১.৮ সংবেদনশীল তন্ত্র

ভ্রুক, চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গের সমন্বয়ে এই তন্ত্রটি গঠিত। সাধারণ ভাষায় এদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলে।

(ক) ভ্রুক : এটি মানবদেহকে বাইরের দিক থেকে সম্পূর্ণ বেষ্টিত করে রাখে। এটি ১-৫ মিলিমিটার পুরু এবং স্বচ্ছিদ্র ভ্রুকের নিচে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বহিরাঘাত থেকে রক্ষা করা, দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করা, সাধারণ সংবেদন স্পর্শ, চাপ, ব্যথা, উষ্ণতা, শৈত্য ইত্যাদি অনুভব করা ভ্রুকের কাজ। ভ্রুক শরীরের বিভিন্ন অপ্রয়োজন বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় ফলে রক্ত পরিশোধিত হয়। যদি রক্তে বিষাক্ত কার্বন জাতীয় পদার্থ বেড়ে যায় তবে কিডনির উপর অধিক চাপ পড়ে। পরিণামস্বরূপ কিডনি বিষাক্ত কার্বন জাতীয় পদার্থ নিষ্কাশন কমিয়ে দেয় এবং রক্তের এই অবশিষ্ট বিষাক্ত পদার্থ ঘামের সাহায্যে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশনের ফলে চর্মরোগ সৃষ্টি হয়। এজন্য নিয়মিত ভ্রুকের যত্ন নেওয়ার জন্য নিম্নের নির্দেশ মেনে চলা উচিত।

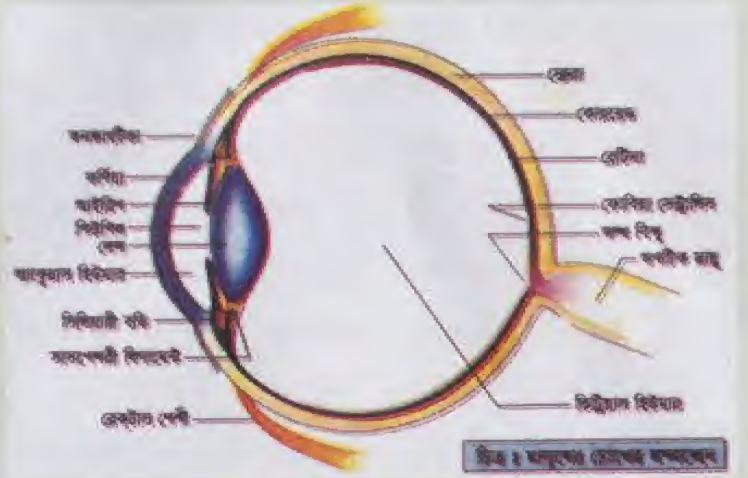
১। প্রচুর পরিমাণ পানি পান করা।

২। শীতকালে চীনাবাদাম, যে কোনো ফল ও সবজি প্রচুর পরিমাণ খাওয়া।

৩। সপ্তাহে একদিন অথবা মাসে দু'দিন তেল ব্যবহার করা।

খ) চোখ (বিন্দু-৩৪) : চোখের গঠন ও কার্যপ্রণালী ক্যামেরার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। একটি সুস্থ চোখ ২৫ সেন্টিমিটার থেকে অসিম দূরত্বের বস্তুস্পষ্ট দেখতে পারে। চোখের সামনের উত্তল স্বচ্ছ আবরণকে কর্নিয়া বলে। এর মধ্য দিয়েই বাইরের আলো চোখে প্রবেশ করে। এটি জানালার কাজ করে। কর্নিয়ার পিছনে অবস্থিত অস্বচ্ছ পর্দাকে আইরিশ বলে। এটি

আলো নিয়ন্ত্রণ করে।
চোখের মনির পিছনে
স্বচ্ছ নমনীয় পদার্থের
পিণ্ডটি চক্ষু লেন্স।
লেসের পিছনে
অক্ষিগোলক সংলগ্ন
স্নায়ু তন্ত্রের তৈরি
গোলাপী পাতলা
আবরনকে রেটিনা



চিত্র-৮

বলে। চোখে আলো পড়লে রেটিনায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং মস্তিষ্কে দর্শন অনুভূতি জাগায়।

চোখের প্রতিটি অংশ একযোগে কাজ করে। চোখে কোনো সমস্যা হলে ৩৪ নং বিন্দুতে ব্যথা অনুভব হয়। চক্ষু স্নায়ুতে সমস্যা হলে হাতের তালুর উল্টা পিঠে ৩৪ নং বিন্দু বরাবর ব্যথা হয়। চক্ষু স্নায়ুর সম্পর্ক পিটুইটারী গ্রন্থির সাথে। এই জন্য চোখের কোনো গুরুতর সমস্যা হলে ৩৪ নং বিন্দুর সাথে ৩ নং বিন্দুতে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

৪৫ বছর পর থেকে নিয়মিত ৩৪ নং বিন্দুতে চিকিৎসা করলে চোখে ছানি পড়ার আশঙ্কা থাকে না।

(গ) কান : কান আমাদের দেহের সংবেদনশীল অঙ্গের মধ্যে একটি। যাকে অডিও রিসিভারের সাথে তুলনা করা যায়। এটি শ্রবণ ও দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শ্রবণ ও বচন একটি যুগলবন্দি ক্রিয়া। অর্থ্যাৎ কোনো শব্দ শুনার পর পরই আমরা কথা বলতে পারি।

গর্ভবতী মা যদি সাইনাস, ম্যাম্পস কিংবা সর্দি ইত্যাদিতে ভোগেন এবং কোনো চিকিৎসার দ্বারা এগুলোকে চাপা দেয়া হয় তবে গর্ভস্থ শিশুর কানের ক্ষতি হয়। এমনকি শিশুটি জন্মবধির হতে পারে।

যারা অধিক মোবাইল ব্যবহার করেন তাদের নিয়মিত সকাল-বিকাল কান ও কানের স্নায়ুর বিন্দুতে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

(ঘ) নাক : আমাদের দেহের আর একটি সংবেদনশীল অঙ্গ হলো নাক। নাকের দুটি নাসিকা ছিদ্রের সাহায্যে আমরা শ্বাস-নিশ্বাস গ্রহণ করি।

তাছাড়াও দেহের তাপের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং কোনো বস্তুর গন্ধ অনুভব করতে নাসিকা ছিদ্র সহায়তা করে। যদি নাসিকা ছিদ্রের দেয়ালে কফ জমে যায়, তাহলে শ্বাস-নিঃশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফুসফুসে বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম নিয়মিত অনুশীলন করলে নাসিকা ছিদ্র পরিষ্কার হয়।

(ঙ) **জিহ্বা** : স্বাদ গ্রহণের সংবেদনশীল অঙ্গগুলোর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া বচন ক্রিয়ায় জিহ্বার বিশেষ ভূমিকা আছে। শরীরের সমস্ত মেরিডিয়নগুলো যেহেতু জিহ্বার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত, তাই নিয়মিত জিভছোলা দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করলে মধ্যচ্ছেদার নিচের সমস্ত অঙ্গগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে, জিহ্বা ও গলা পরিষ্কার হয় এবং টনসিল, ডিপথেরিয়া এবং গলার অসুস্থতার বিশেষ উপকার হয়।

১.৯ গ্রন্থি তন্ত্র

মানবদেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নানা ধরনের কোষ বা কোষগুচ্ছ দেহের বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে তাকে গ্রন্থি বলে। মানবদেহে দু'ধরনের গ্রন্থি আছে।

(ক) **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** : যেসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস নালিকার মাধ্যমে উৎপত্তি স্থলের অদূরেই ক্রিয়া করে তাদের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। যেমন লালা গ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি। এরা দেহের সীমিত স্থানে সক্রিয় থাকে। এসব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রসকে এনজাইম বলে।

(খ) **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** : যেসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস সরাসরি রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে সমগ্র দেহে বা দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট কোনো অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয় তাদেরকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। এদেরকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিও বলে। যেমন পিটুইটারী, থাইরয়েড, এড্রিনাল ইত্যাদি। এদের ক্ষরিত রসকে হরমোন বলে। মূলত এসব গ্রন্থিগুলোই মানসিক ও চারিত্রিক গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এদের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যঘাত ঘটলে আমাদের স্বভাবের উপর এর প্রভাব পড়ে। যেমন যাদের এড্রিনাল গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়া না করে তাদের লিভারের ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি ভীকু খিটখিটে ও বদ মেজাজী হয়।

যৌন গ্রন্থি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সক্রিয় ব্যক্তি হিংসুক, কামুক ও স্বার্থপর হয়। থাইমাস গ্রন্থি অস্বাভাবিক হলে সেই ব্যক্তি কুটিল স্বভাবের

হয়। যাদের পিটুইটারী গ্রন্থি স্বাভাবিক নয় তারা নির্দয় ও অপরাধ প্রবন হয় এরা চোর, ডাকাত এমনকি খুনীও হতে পারে। অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি ক্ষতি গ্রস্ত হলে নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠতে পারে। এসব গ্রন্থির কাজ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিচে এদের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার ব্যঘাত ঘটলে আমাদের দেহ, মন ও চরিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব পড়ে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

(গ) থাইমাস গ্রন্থি (বিন্দু-৩৮) : শিশুর জন্য এ গ্রন্থিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু প্রাপ্ত বয়স (১২-১৫ বছর) না হওয়া পর্যন্ত এটি ধাত্রী-মাহিসাবে কাজ করে। শিশুর রোগ প্রতিরোধেও এই গ্রন্থিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের গঠন পূর্ণ হলে এটি ছোট হয়ে যায় এবং কাজ বন্ধ করে দেয়।

কোনো কারণে এটি যদি পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠে তবে জড়তা ও অবসাদের কারণে দেহ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

(ঘ) থাইরয়েড/প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (বিন্দু-৮) : এই গ্রন্থিটি দেহের সুস্থতা নির্দেশক ব্যারোমিটার। দেহে কোনো সমস্যা ৮/১০ দিন স্থায়ী হলেই ৮নং বিন্দুতে ব্যথা অনুভব হয়। এটি ক্যালসিয়াম হজম করে দেহ থেকে বিষাক্ত বস্তুনির্মূল করে। দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি স্নেহ, ভালোবাসা, চিন্তা শক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যার ফলে স্বভাবের মধ্যে নির্মল হৃদয়, নিঃস্বার্থ চিন্তা, শান্ত ও সংযমী ভাব দেখা যায়।

ক্রিয়ার ব্যঘাত ঘটলে : স্বাভাবিকের চেয়ে কম সক্রিয় হলে দুর্বলতা ও পেশীতে মোচড় ধরে। যার ফলে রিকেট ও খিচুনি দেখা দেয়। মানসিক ভারসাম্য হারায়, বেশী কথা বলে ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

অধিক ক্রিয়া করলে : এ গ্রন্থিটি অধিক সক্রিয় হলে অতি বৃদ্ধি, চোখ ঠেলেউঠা, গলগণ্ড, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আসা ও স্বভাবে নির্মমতা দেখা দেয়। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড এই গ্রন্থির অধীন থাকে। এই গ্রন্থি ক্রিয়ার ব্যঘাত ঘটলে হার্ট ও ফুসফুসের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যঘাত ঘটে ফলে চেহারা ফুলে যায়, সামান্য পরিশ্রম বা উত্তেজনায় বুক ধড়পড় করে এবং হাঁপিয়ে উঠে। হৃৎপিণ্ডের গতি ও রক্ত চাপ বেড়ে যায়। অস্থিরতা ও অনিদ্রা বেড়ে যায় এবং কর্মদক্ষতা কমে যায়। অধিক হরমোন ক্ষরণের ফলে রক্তের তরলতা কমে যায়।

বয়ঃসন্ধির পর থেকে এই গ্রন্থি ঠিকমতো কাজ না করলে পেটে/কিডনিতে পাথর জমে।

যৌন গ্রন্থির সাথে এ গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে মেয়েদের ক্ষেত্রে সন্তান ধারণের সময়, প্রসবের পর কিংবা জরায়ু অপারেশানের পর দেহ স্থূল হয় এবং পেটে ও কোমরে চর্বি জমে।

এই গ্রন্থিটি যথেষ্ট শক্তিতে কাজ না করলে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে দেহে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণের জন্য বাড়তি ক্যালসিয়াম গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

(৩) যৌন ও পোস্টেট গ্রন্থি বিন্দু (১১-১৫) : এ গ্রন্থিগুলি সন্তান উৎপাদনের অব্যাহত ধারা সচল রাখে। এরা দেহে ফসফরাস হজম ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে দেহে জলীয় উপাদান, স্নায়ু কোষ, মাংস, হাড় মজ্জা ও বীৰ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এ গ্রন্থি যদি ঠিকমতো কাজ করে, তাহলে শরীরের তাপমাত্রা ঠিকমতো রক্ষা হয়। কিশোর কিশোরীদের চেহারা আকর্ষণীয় হয়ে উঠে, তাদের স্বভাব প্রকৃতি মনোরম হয় এবং তাদের কথা-বার্তা, আদব-কায়দা মানুষকে মুগ্ধ করে। তারা সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। যৌবনকালে সুখী দাম্পত্য জীবন উপভোগ করে। মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা কালে এ গ্রন্থি চিকিৎসা করলে দেহের সৌন্দর্য ঠিক থাকে।

ক্রিয়া ব্যঘাত ঘটলে : শিশুদের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থির ক্রিয়ার ব্যঘাত ঘটলে এর প্রভাব চোখে পড়ে যখন তাদের বয়স ১২-১৪ বছর হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে : রক্তস্রাব বিলম্বিত, প্রচণ্ড ব্যথা হয়, স্রাব খুব কম সময় হয় যার ফলে মুখে ব্রন হয় এবং দেহের অত্যধিক তাপ দেখা দেয় অথবা কখন ও কখন ও অত্যধিক রক্তস্রাব হয়ে রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। শ্বেত প্রদর রোগ দেখা দেয়। কখনও কখনও এই গ্রন্থির কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবার কারণে সন্তান ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

ছেলেদের ক্ষেত্রে : এ গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে হস্ত মৈথুনের প্রবণতা বেড়ে যায়, স্বপ্নদোষে আক্রান্ত হয়, লাজুক হয়ে পড়ে, দাঁড়ি গোঁফ দেরিতে গজায় এবং দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

বার্ষিক বয়সে যদি এ গ্রন্থি সঠিকভাবে কাজ না করে তবে হার্নিয়া হতে পারে। ৫০ বছরের পর হতে (১১ থেকে ১৫) নং বিন্দুতে নিয়মিত চাপ

প্রয়োগ করলে বাধ্যক্য জনিত দুর্বলতা হ্রাস পায় এবং হার্নিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৫) অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি (বিন্দু নং ২৫) : রক্তের মধ্যে যে চিনি খাদ্য রস থেকে আসে এটি ইনসুলিন নিঃসরণের মাধ্যমে ঐ চিনিকে হজম করতে সাহায্য করে। যে চিনি খাদ্য শস্য, ফল দুধ ও মধু থেকে রক্তে আসে এটি সহজে হজম যোগ্য নয়। এজন্য এই গ্রন্থির ঠিকভাবে কাজ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

শরীরের উত্তেজনা যখন বেড়ে যায় অথবা শরীরে যখন বেশি উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়। তখন শরীরের বিভিন্ন অংশে বেশি পরিমাণ শর্করা ও শক্তি পৌঁছে যায় এবং বেশি পরিমাণ ইনসুলিনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই সময় এড্রিনাল গ্রন্থির নির্দেশে অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি হঠাৎ স্বক্রিয় হয় এবং ইনসুলিন উৎপাদনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। এক সময় এই গ্রন্থিটি অত্যন্ত ধীর গতি সম্পন্ন হয় এবং ইনসুলিন উৎপাদনের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হয়। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। এ অবস্থাকে মধুমেহ বা Diabetes বলে। যাদের শরীরে ওজন কম কিন্তু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তারা সামান্য কিছুতেই উত্তেজিত হয়ে উঠেন। তাদের ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিকে কার্যকর করার সাথে সাথে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য এড্রিনাল গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সেই সাথে উত্তেজনার কারনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

যে সমস্ত গর্ভবতী মা যে কোনো কারণে বেশি উত্তেজনায় ভোগেন, তাদের গর্ভস্থ সন্তান জন্মের পর পরই ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৬) এড্রিনাল গ্রন্থি (বিন্দু নং ২৮) : এই গ্রন্থিটি দেহে সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। গ্লীহা, যকৃত, পিত্তাশয় এবং অগ্ন্যাশয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। পিত্ত ও জারক রস সৃষ্টিতে সাহায্য করে, দেহে রক্ত চলাচল বাড়ায় এবং উপযুক্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে। শর্করা ও খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। যৌনাস্রের বৃদ্ধি ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে। তাছাড়া তীক্ষ্ণ উপলব্ধি, অক্লান্ত পরিশ্রম, কাজে উৎসাহ, অন্তর্নিহিত শক্তি ও সাহস সব কিছুর পিছনে এ গ্রন্থির অবদান রয়েছে। জরুরিকালীন অবস্থায় দেহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে সহায়তা করে। শিশুর চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

ক্রিয়া ব্যঘাত ঘটলে : যাদের এই গ্রন্থিটি ক্ষতিগ্রস্ত তারা আত্মগরিমায় ভোগে, উদ্ধত, ছটফটে, অসহিষ্ণু এবং ক্রোধী স্বভাবের হয়। তাদের লালসা পূরন করতে অসামাজিক কাজকর্মে প্রাণ শক্তি ব্যয় করে। তারা খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না ফলে পেটের গোলযোগ ও উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ধীরে ধীরে তারা ভীতু, নিরহী ও জীবনের সমস্যার মুখোমুখি হতে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

(জ) পিটুইটারী গ্রন্থি (বিন্দু নং-৩) : এ গ্রন্থিটি সকল গ্রন্থির রাজা এবং অন্যান্য গ্রন্থি এ গ্রন্থির নির্দেশে চলে। এ গ্রন্থি দৈহিক বৃদ্ধি, ত্বকের রং, মাতৃদেহের দুগ্ধ ক্ষরণ এবং জরায়ু সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া জনন গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্য এ গ্রন্থি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের ইচ্ছা শক্তি, স্মৃতি শক্তি ও বিচার শক্তি এ গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণ করে। এ গ্রন্থির প্রভাবে মানুষ বিশেষ গুণ সম্পন্ন হয় যেমন কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মানবসেবী ইত্যাদি হয়।

এ গ্রন্থি প্রয়োজনের তুলনায় কম কাজ করলে বামনত্বের সম্ভাবনা থাকে এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কাজ করলে দেহ বৃহদাকার হতে পারে।

ক্রিয়া ব্যঘাত ঘটলে : ভয়, আঘাত এবং গর্ভাবস্থায় চাপা উত্তেজনার ফলে এ গ্রন্থিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। যেহেতু এটি সকল গ্রন্থির রাজা। সুতরাং এটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যান্য গ্রন্থিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থিটি সঠিকভাবে কাজ না করলে তাদের মধ্যে উৎপীড়ন করা, অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা বলা, ভবঘুরে জীবনযাপন করা এমনকি তারা চুরি করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

গর্ভবতী মহিলাদের এ গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে গর্ভস্থ শিশুটি মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য গর্ভাবস্থায় এটি ও অন্যান্য গ্রন্থিগুলোর চিকিৎসা করা দরকার।

(ঝা) পিনিয়াল গ্রন্থি (বিন্দু নং-৪) : এ গ্রন্থিটি অন্যান্য গ্রন্থির সংগঠক এবং অন্যান্য গ্রন্থিগুলো বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ গ্রন্থির আধিক্যে মানুষ ধার্মিক হয় এবং ঐশী গুণ সম্পন্ন হয়। এ ব্যক্তির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও দয়ালু স্বভাবের হয়। দৈহিক দুঃখ কষ্টের সময় তাঁরা অবিচল থাকে। এটি মানুষের দেহে সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের বিপাক দ্রুত করে। যৌনাস্থের সক্রিয়তা ঘটাতে সহায়তা করে।

ক্রিয়া ব্যাঘাত ঘটলে : উচ্চরক্ত চাপ, অকালে যৌনতার বিকাশ এমনকি যৌন দোষও ঘটে। দেহে তরল পদার্থের আধিক্য ঘটে অনেক সময় একে কিডনি অসুখ বলে ভুল করে থাকে। এ গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যান্য গ্রন্থিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(এ৩) লসিকা গ্রন্থি (বিন্দু নং-১৬) : এ গ্রন্থিটি এন্টিবায়োটিকের ভূমিকা পালন করে। সব রকমের কাটা ফোঁড়ার উপর পুঁজ হওয়া রোধ করে এবং ক্ষতস্থান শীঘ্র সারিয়ে তোলে। শরীর থেকে জৈব বিষ (Toxin) ও মৃত কোষ দূর করে।

ক্রিয়া ব্যাঘাত ঘটলে : এ গ্রন্থির যে কোনো যন্ত্রণাই ক্যান্সারের পূর্বাভাব।

১. এ গ্রন্থির সাথে জরায়ুর বিন্দুর ব্যথা জরায়ু ক্যান্সারের পূর্বাভাস এই গ্রন্থির সাথে স্তনের বিন্দুর ব্যথা স্তন ক্যান্সারের পূর্বাভাস।

২. এ বিন্দুর সাথে অগ্ন্যাশয় বিন্দুর ব্যথা ডায়াবেটিস-এর ভয়াবহতার পূর্বাভাস।

৩. যদি দেহে মৃত কোষের পরিমাণ খুব বেড়ে যায়, তাহলে এই গ্রন্থির উপর চাপ পড়ে এবং এ গ্রন্থি দুর্বল হয়ে যায়। তখন ১৬নং বিন্দুতে চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হয়।

দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল রোগের ক্ষেত্রে অধিকাংশ গ্রন্থিগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত থাকে। প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে গ্রন্থিগুলো অকেজো থাকে এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে গ্রন্থিগুলো অধিক কাজ করার ফলে নরম ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সকল গ্রন্থিগুলো এবং এরা যে সকল অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের নিয়মিতো আকুপ্রেসার চিকিৎসা করে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

তাছাড়া মানুষের ইচ্ছা শক্তি ও মানসিক অনেক সমস্যাই এ গ্রন্থিগুলোর সাথে সম্পর্কিত। এজন্য যদি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ অমনোযোগী ও দুষ্ট ছাত্র/ছাত্রীদের উপর এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশের অপরাধ শাখা তরুণ অপরাধীদের উপর এই চিকিৎসা চালান, তবে খুব ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

শিশু ও কিশোরদের এসব গ্রন্থির ও অন্যান্য অঙ্গের আকুপ্রেসার চিকিৎসার পথ ধরিয়ে দিতে পারলে শুধু যে তাদের শারীরিক বৃদ্ধিই হবে এমন নয়, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের দেহের সৌন্দর্য বাড়বে, অপরাধ প্রবণতাবোধও কমবে, জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তোলার মন মানসিকতা অর্জন করবে এবং সমাজে সুনামের হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

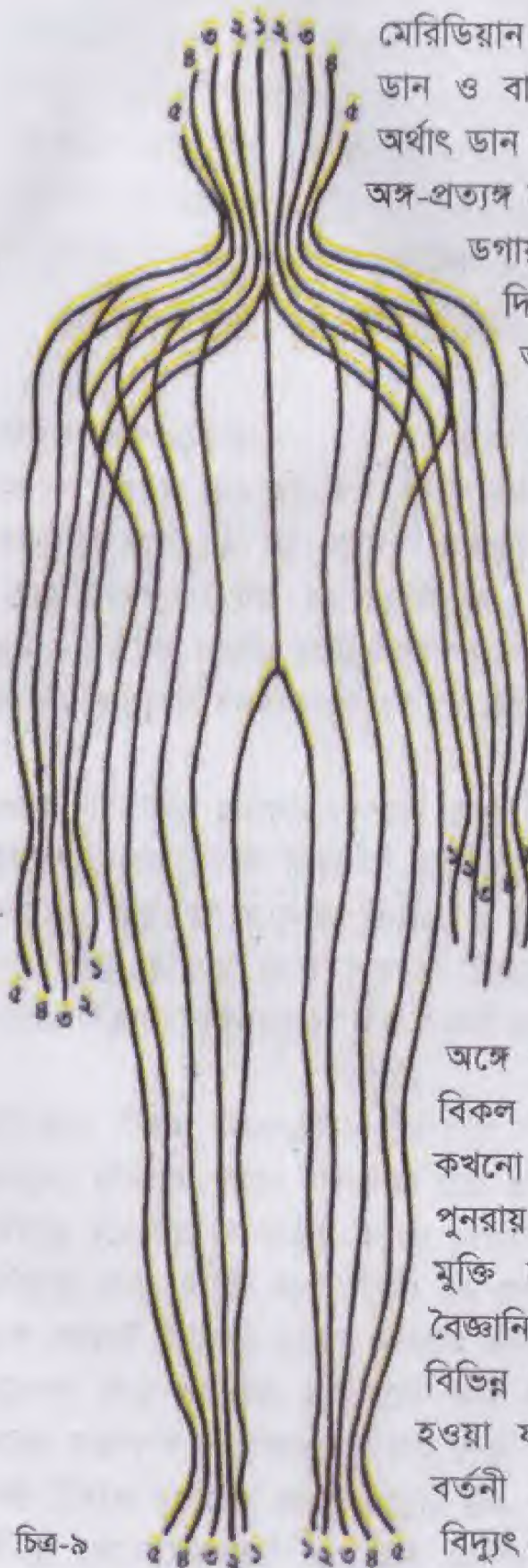
দ্বিতীয় অধ্যায়

আকুপ্রেসার চিকিৎসার নিয়মাবলি ও বিন্দু পরিচয়

(ক) আকুপ্রেসার চিকিৎসা পদ্ধতি কী? : আকুপ্রেসার শব্দটি আকুপাংচার থেকে এসেছে। এ্যাকিউ শব্দের অর্থ সূঁচ এবং পাংচার শব্দের অর্থ বিদ্ধ করা। শরীরের বিশেষ বিশেষ বিন্দুতে সূঁচ বিদ্ধ করে চিকিৎসা করার পদ্ধতি হলো আকুপাংচার। আকুপাংচারের এই বিন্দুগুলো হাত-পায়ের আঙুলের ডগা থেকে শুরু করে সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। এদের সংখ্যা প্রায় ৯০০। যে কোনো আনাড়ী ব্যক্তির পক্ষে এসব বিন্দু নির্ণয় করে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

আকুপ্রেসার হলো শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় বৃদ্ধাঙুলী অথবা অন্য কোনো ভোতা বস্তু দ্বারা চাপ দিয়ে চিকিৎসা করা। আকুপ্রেসারের অধিকাংশ বিন্দুগুলো হাতের তালু ও পায়ের তালুতে অবস্থিত। এদের সংখ্যা মাত্র ৩৮টি। এই বিন্দুগুলোর অবস্থান জানা মতোই সহজ যে, কোনো ব্যক্তি এমনকি দশ বছরের শিশুও এই বিন্দুগুলোর অবস্থান জেনে প্রয়োগ করতে পারে।

(খ) আকুপ্রেসারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা : ধনাত্মকধর্মী একটি শূত্রকীট ঋণাত্মকধর্মী ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট নামক ব্যাটারি সেলের মতো বস্তুতে পরিণত হয়। এ অবস্থা থেকে বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিটি কোষে এই বৈদ্যুতিক বর্তনী স্থাপিত হয়। জ্রণ যখন পূর্ণাঙ্গ মানব আকৃতি ধারণ করে তখন এই জীবন ব্যাটারি মস্তিষ্কে স্থাপিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মস্তিষ্কের ১ম ভেন্টিকলের মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে ধনাত্মক প্রবাহ এবং ২য় ভেন্টিকলের মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে ঋণাত্মক প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং মস্তিষ্ক থেকে এই বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমনকি প্রতিটি কোষে পৌঁছে যায়। এ বিদ্যুৎ প্রবাহের বর্তনী



মেরিডিয়ান নামে পরিচিত (চিত্র-৯)। এটি ডান ও বাম এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ডান দিকের প্রবাহ ডান দিকের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে ডান হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ডগায় শেষ হয়েছে। অনুরূপভাবে বাম দিকের প্রবাহ বাম দিকের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে বাম হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ডগায় শেষ হয়েছে। এজন্য হাত ও পায়ের তালুর বিভিন্ন বিন্দু হলো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সুইচ। এই বর্তনীর মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে, তাকে জৈব বিদ্যুৎ বলে। যতক্ষণ এ বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীরের মধ্যে ঠিকমতো প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ শরীর সুস্থ ও সবল থাকে।

কোনো কারণবশতঃ যদি এই বিদ্যুৎ প্রবাহ দেহের কোনো অঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই সেখানে বিকল অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো ব্যথা হয়। যদি এই বিদ্যুৎ প্রবাহ পুনরায় প্রবাহিত করা যায়, তবে রোগ মুক্তি হয়। আকুপ্রেসার হলো সেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক বর্তনী মেরামতো করত পুনরায় এই বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠানো যায়।

যেমন কেহ জন্ডিসের জীবাণু যুক্ত খাদ্যগ্রহণ করলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জন্ডিসের জীবাণু লিভারে বাসা বাধে এবং লিভারে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। সাথে সাথে লিভারের সুইচ অর্থাৎ হাতের তালু ও পায়ের তালুতে অবস্থিত লিভারের অনুরূপ বিন্দুতে ব্যথা হয়। কিন্তু রক্তে জন্ডিসের লক্ষণ ধরা পড়ে চার দিন পর এবং পাঁচ দিন পর চোখ ও প্রস্রাবে-এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুতরাং আকুপ্রেসারের সাহায্যে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই জন্ডিস নির্ণয় সম্ভব। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় চারদিনের আগে জন্ডিস নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আবার কোনো রোগের লক্ষণ ৩০ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ প্রকাশ পাওয়ায় আগে ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। কিন্তু আকুপ্রেসারের মাধ্যমে মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ সমস্যা হলেই ধরা পড়ে।

কখন এ বিদ্যুৎ প্রবাহ শেষ হয় : ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এই বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী এবং দুরারোগ্য রোগীদের দেহে এই বিদ্যুৎ শক্তি পোস্টেট গ্রন্থিতে স্থিতিশক্তি আকারে জমা থাকে। এই অবস্থায় পোস্টেট গ্রন্থিতে নিয়মিতো চিকিৎসা করলে প্রথমে এই বিদ্যুৎ যৌন গ্রন্থিতে প্রবেশ করে, ফলে যৌন শক্তি বৃদ্ধি পায়; যখন অল্প গুচ্ছে প্রবেশ করে তখন হৃদয় শক্তি ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির শক্তি বৃদ্ধি পায়; যখন থাইরয়েড/প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রবেশ করে, তখন দেহের বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়ে শরীর শক্তিশালী হয় এবং যখন পিটুইটারী ও পিনিয়াল গ্রন্থিতে পৌঁছে, তখন স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(গ) আকুপ্রেসার ও REFLEXOLOGY : আমাদের শরীরের কোনো অঙ্গে রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে বা অঙ্গটি অধিক কাজ করলে বা অন্য কোনো কারণে অঙ্গটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ঐ অঙ্গের সাথে যুক্ত মেরিডিয়াম রেখার চার পাশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা অন্য কোনো বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়। তখন ঐ অঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। এ রোগ বা ব্যথার কারণে অঙ্গটিতে কখনো কখনো ব্যথা হয়। এই রোগ বা ব্যথা অঙ্গটির সুইচ (হাতের ও পায়ের তালুতে) অবস্থিত বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় এবং সেখান চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হয়। এজন্য এ চিকিৎসাকে “REFLEXOLOGY” ও বলা হয়।

(ঘ) ব্যথার প্রকৃতি : আকুপ্রেসারের বিন্দুগুলোতে চাপ দিলে যে ব্যথা অনুভূত হয়, এটি সাধারণ চাপ দেয়ার ব্যথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ব্যথা

কষ্টদায়ক, সুঁচ ফুটানোর মতো অনুভূত হয়। চাপ দেয়ার ফলে কপালে কুঞ্জন এবং চোখে স্পন্দন দেখা দেয়। ব্যথার মাত্রা থেকে সমস্যার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

(ঙ) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা : শরীরের কোনো অঙ্গ ৮/১০ দিন অসুস্থ থাকলে থাইরয়েড গ্রন্থিটি অস্থির হয়ে পড়ে এবং ৮নং বিন্দুতে চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হয়। অতএব থাইরয়েডের বিন্দু হলো আমাদের শরীরের অসুস্থতার সিগন্যাল বিন্দু। সুতরাং রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে থাইরয়েড বিন্দু থেকে শুরু করে রোগীর সমস্যানুসারে অন্যান্য বিন্দুতে চাপ দিয়ে রোগ নির্ণয় করতে হবে।

পুকুরে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনো ভাবে ঢেউ সৃষ্টি করলে সে ঢেউ যেমন পাড়ে এসে আঘাত করে, ঠিক তেমনইভাবে আকুপ্রেসারের কোনো বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করলে সেখানে সৃষ্ট শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ঢেউ ঐ অঙ্গের মেরিডিয়ান রেখার সংযোগ বিন্দুতে আঘাত করে। ফলে ঐ অঙ্গে জমা হওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা অন্য কোনো বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ বের করে রক্তের মধ্যে নিয়ে আসে এবং ঐ অঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে অঙ্গটি সুস্থ হয়ে উঠে। রক্ত থেকে এ বর্জ্য পদার্থ কিডনির মাধ্যমে হেঁকে প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে বের করে দেয়। এই ভাবে বিষাক্ত বর্জ্য কিডনির মাধ্যমে বের করলে কিডনির উপর অধিক চাপ পড়ে ফলে কিডনির কর্মক্ষমত্যা লোপ পায়। এজন্য সকল ব্যথার বিন্দুতে চিকিৎসা করার পর কিডনির ২৬ নং বিন্দুতে চাপ দেওয়া প্রয়োজন। যেমন ডান হাতের সকল ব্যথার বিন্দুগুলিতে চাপ দেওয়ার শেষে কিডনির ২৬ নং বিন্দুতে চাপ দেওয়ার প্রয়োজন এবং বাম হাত, বাম পা ও ডান পায়ের বিন্দুগুলোতে একেই নিয়মে চাপ দিতে হবে।

কোনো অঙ্গের সুইচে ব্যথা হলেই তা চাপ দিয়ে বের করে দিন এটিই হলো আকুপ্রেসারের মূলনীতি

(চ) চাপ দেয়ার পদ্ধতি : রোগ অনুসারে হাতের তালু এবং পায়ের তালুর ব্যথার বিন্দু (Pain Point)-এর উপর এবং তার চার-পার্শ্বে খাড়া ভাবে চাপ দিতে হবে। তবে বেশি সংখ্যক চাপ ব্যথার বিন্দুতেই দিতে হবে। চাপ হবে আরামদায়ক পাম্প করার মতো থেমে থেমে এক নাগাড়ে

নয়। যতটুকু চাপ রোগী সহ্য করতে পারেন, ততটুকু জোরেই চাপ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে রোগীর স্বাস্থ্য, ধৈর্য্য ও বয়স ইত্যাদির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে যেহেতু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর বিন্দু (৩, ৪, ৮, ১৬, ২৫, ২৮ এবং ৩৮) শরীরের গভীরে অবস্থিত, সেহেতু এসব বিন্দুতে একটু জোরে চাপ দিতে হবে। আবার পায়ের চামড়া পুরো হওয়ায় পায়ের বিন্দুগুলোতেও জোরে চাপ দিতে হয়।

(ছ) কতক্ষণ চাপ দিতে হবে : প্রতিটি ব্যথার বিন্দুতে ৫০ থেকে ৬০ বার চাপ দিতে হবে অথবা সর্বোচ্চ দু'মিনিট চাপ দিতে পারেন। প্রতিদিন সকাল বেলা ও রাত্রিবেলা চাপ দিতে হবে অথবা প্রয়োজনে তিনবারও চাপ দেয়া যেতে পারে। তবে দুই বার চাপের মধ্যে ছয় ঘণ্টা ব্যবধান হওয়া প্রয়োজন।

(জ) কখন চাপ দিতে হবে : চাপ দেয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। যে কোনো সময়, যে কোনো অবস্থায় যেমন বসে, শুয়ে এমনকি হাঁটতে-হাঁটতেও চাপ দেয়া যায়। তবে আহারের ১ ঘণ্টার মধ্যে এবং খুব ক্ষুধার্ত অবস্থায় চাপ দেয়া ঠিক নয়।

(ঝ) কতদিন চাপ দিতে হবে : কোনো অঙ্গের অনুরূপ বিন্দুতে যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যথা নির্মূল না হয় ততদিন পর্যন্ত ঐ বিন্দুতে এবং তার চার পাশে চাপ দিতে হবে।

আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এক একটি যন্ত্র বিশেষ। পরিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা এবং বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কোনো অঙ্গে ক্লান্তি, অবসাদ বা বিকল অবস্থা সৃষ্টি হতেই পারে। এজন্য হাতের তালু ও পায়ের তালুর সবগুলো বিন্দুতে প্রতিদিন (প্রতিটি বিন্দুতে ৮-১০বার এবং কোনো বিন্দুতে ব্যথা থাকলে ২০-২৫বার) দশ মিনিট চাপ দিয়ে প্রতিটি অঙ্গ ও গ্রন্থিগুলোকে ব্যাটারি সেলের মতো রিচার্জ করতে পারি। এতে করে সমস্ত অঙ্গ ও গ্রন্থিগুলো সুস্থ ও সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে এবং শরীর সুস্থ থাকবে।

(ঞ) প্রতিক্রিয়া : এভাবে চাপ দেয়ার ফলে বিন্দুগুলো হতে প্রথম দুই দিন হয়ত কোনো সাড়া পাওয়া যাবে না। কারণ মতোদিন এগুলো অকেজো ছিল। তৃতীয় দিন হতেই বিন্দুগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তবে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই।

কখনো কখনো দেখা যায় দুই-তিন দিন চাপ দেয়ার ফলে বিন্দুর ব্যথাও বেড়ে গেছে সেই সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ব্যথাও বেড়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ অঙ্গে হঠাৎ নাড়া পড়ার কারণে এইরূপ হতে পারে।

(ট) সতর্কতা : অনেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার আশায় ব্যথার বিন্দুতে অনেক সময় ধরে চাপ দেন অথবা দিনে অনেক বার চাপ দেন। এর ফলে নিম্নের সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে :

১। কোনো বিন্দুতে একাধারে তিন মিনিট সময় চাপ দিলে ঐ বিন্দুর সাথে সম্পর্কিত অঙ্গের অনুভূতি কিছু সময়ের জন্য লোপ পায়।

২। সুইচ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

৩। জীবন ব্যটারি অধিক কাজ করে এবং দেহে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় ফলে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

৪। কিডনিতে অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থের চাপ পড়ায় এর ক্ষতি হতে পারে।

তবে বেশি মাথা ব্যথা ও পেট ব্যথার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিরামহীন চাপ উপকারী।

(ঠ) বিনা যন্ত্রে চেক-আপ ও বিনা খরচে চিকিৎসা : কোনো রোগীর চিকিৎসা করার পূর্বে রোগের মূল কারণ কি তা জানা চিকিৎসকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

বর্তমানে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির যুগে রোগ নির্ণয়ের জন্য শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াও মল, মূত্র ও রক্ত পরীক্ষা এক্স-কে, ই.সি.জি, সনোগ্রাফী, কার্ডিও গ্রাম, ব্রেণ-স্ক্যানিং ইত্যাদি রিপোর্টের প্রয়োজন হয়। এইগুলো হলো ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া যা অধিকাংশ রোগীর সামর্থের বাইরে। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। হেকিমী, আয়ুর্বেদ ইউনানী পদ্ধতিতে রোগ নিরাময়ের চিকিৎসা উপাদান দুঃপ্রাপ্য ও অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

হোমিও-প্যাথি পদ্ধতিতে রোগীর সাথে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়। যার ফলে একজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সাহেবও অল্প কয়েকজন রুগীকে চিকিৎসা দিতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর অনেক গোপনীয় সমস্যা প্রকাশ করতে ইতস্তত বোধ করেন। ফলে প্রকৃত রোগের চিকিৎসা হয় না।

আকুপ্রেসার পদ্ধতিতে খুব সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই রোগের মূলে পৌঁছা যায়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর নিকট থেকে কোনো তথ্য জানারও প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া আকুপ্রেসারের বিন্দুগুলোর অবস্থান হাতে তালু ও পায়ের তালুতে হওয়ায় কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও চিত্রের পাশাপাশি হাত রেখে খুব সহজেই শরীরের কোনো অঙ্গের অনুরূপ বিন্দুতে চাপ দিয়ে ঐ অঙ্গের সুস্থতা-অসুস্থতা সম্বন্ধে জানতে পারেন। এ পদ্ধতিটি মতো সহজ যে এটি শেখার জন্য বেশি সময়ও ব্যয় করতে হয় না।

শিশুদের রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আকুপ্রেসার বিশেষভাবে কার্যকরী। কারণ শিশুরা নিজেদের সমস্যা প্রকাশ করতে পারে না তারা শুধু কাঁদতে জানে। কোনো অঙ্গে সমস্যা হলে ঐ অঙ্গের অনুরূপ বিন্দুতে চাপ দিলে হয় সে হাত-পা সরিয়ে নিবে অথবা কেঁদে উঠবে। তাছাড়া শিশুদের গ্রন্থিগুলো যদি প্রতিদিন ৫ মিনিট চিকিৎসা করা হয় তাহলে তারা সুস্থ সবল ও বিশেষ চারিত্রিক গুণাবলি সম্পন্ন হয়ে উঠবে।

বোবাদের জন্য এ চিকিৎসা বিশেষ উপযোগী, কারণ তারাও তাদের সমস্যার কথা প্রকাশ করতে পারে না।

(ড) প্রয়োজনীয় যন্ত্র : আকুপ্রেসার চিকিৎসায় বিশেষ কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন নাই। উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি হলো প্রধান যন্ত্র। তবে একাধিক



শেফাকাঠি



হ্যান্ডরোলার



ফুটরোলার

চিত্র ১০

বিন্দুতে সমস্যা থাকলে এবং পায়ের তালুর চামড়া মোটা হওয়ায় ও বিন্দুগুলো গভীরে থাকায় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বিন্দুগুলো সনাক্ত করা ও চিকিৎসা করা কঠিন। এর ফলে বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যথা হয়ে যায়। এজন্য চাপ

দেওয়ায় সুবিধার্থে এবং শরীরের সব অঙ্গের সুইচগুলো তথা অঙ্গগুলোকে সক্রিয় রাখার জন্য আমরা নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলো ব্যবহার করি।

হ্যান্ড রোলার ও ফুট রোলার নিয়মিতো দিনে দুইবার (সকালে নাস্তার পরে ও রাতে খাবারের পরে) ব্যবহার করলে নিম্নের উপকার গুলো হয়।

১। হজম প্রণালীসহ শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ সক্রিয় হয়।

২। ডাইবেটিস, এসিডিটি, গ্যাসট্রিক, মেদ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা করে।

৩। হাঁটু, কোমর, পিঠ ও গাঁটের ব্যথা ইত্যাদি সাইটিকা জনিত সমস্যা নিরাময় করে।

৪। ১৮ বছরের নীচের ছেলে মেয়েদের উচ্চতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৫। ক্লান্তি অবসাদ ও অনিদ্রা দূর করে। ৪০ বছরের বয়সের পর প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়মিত এ রোলারগুলো নিয়মিত ব্যবহার করলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সতেজ থাকবে এবং রোগের প্রবণতা কমে যাবে।

(ঢ) সেফা কাঠি ব্যবহারের নিয়ম : প্রথমে ১১নং চিত্রের অনুরূপভাবে ধরতে হবে। তারপর শাহাদাৎ আঙুল ও বৃদ্ধাঙুল দ্বারা ১২নং চিত্রের অনুরূপ



চিত্র ১১



চিত্র ১২

শক্তি ভাবে ধরে বাকি আঙুলগুলোর প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক আঙুল বিন্দুর বিপরীত দিকে সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

২.২ বিন্দু পরিচয় :

(ক) আকুপ্রেসারের বিন্দুগুলোর অবস্থান : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের শরীরে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে, তার বর্তনী হাতের তালু ও পায়ের

তালুতে শেষ হয়েছে। এজন্য হাতের তালু ও পায়ের তালুই হচ্ছে ঐ বিদ্যুৎ প্রবাহের সুইচ বোর্ড। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গের সুইচ হচ্ছে হাতের তালু ও পায়ের তালুর অনুরূপ বিন্দু।

অধিকাংশ অঙ্গ ও অঙ্গাঙ্গরা গ্রন্থি শরীরের ডান ও বাম উভয় দিকেই অবস্থিত। সুতরাং তাদের অনুরূপ বিন্দুগুলো উভয় হাত ও উভয় পায়ের তালুতেই অবস্থিত। আবার যেহেতু লিভার, পিত্তথলি এবং উপাঙ্গ (Appendix) শরীরের ডান দিকে অবস্থিত, অতএব তাদের বিন্দুগুলো ডান হাত ও ডান পায়ের তালুতে অবস্থিত। হার্ট ও প্লীহা শরীরের বাম দিকে অবস্থিত অতএব তাদের অনুরূপ বিন্দুগুলো বাম হাতের তালু ও বাম পায়ের তালুতে অবস্থিত। নিচের (চিত্র ১৩-১৬) চিত্রগুলোতে তাদের অবস্থান দেওয়া হলো।



ডান হাতের বিন্দুসমূহ (চিত্র-১৩)



বাম হাতের বিন্দুসমূহ (চিত্র-১৪)

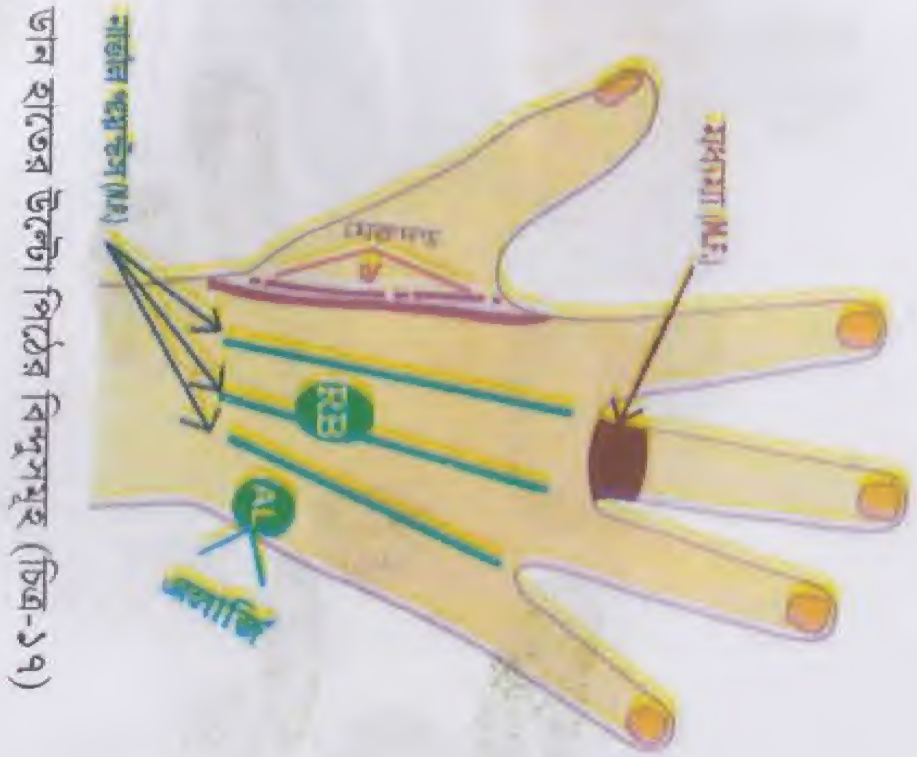


ডান পায়ের বিন্দুসমূহ (চিত্র-১৫)

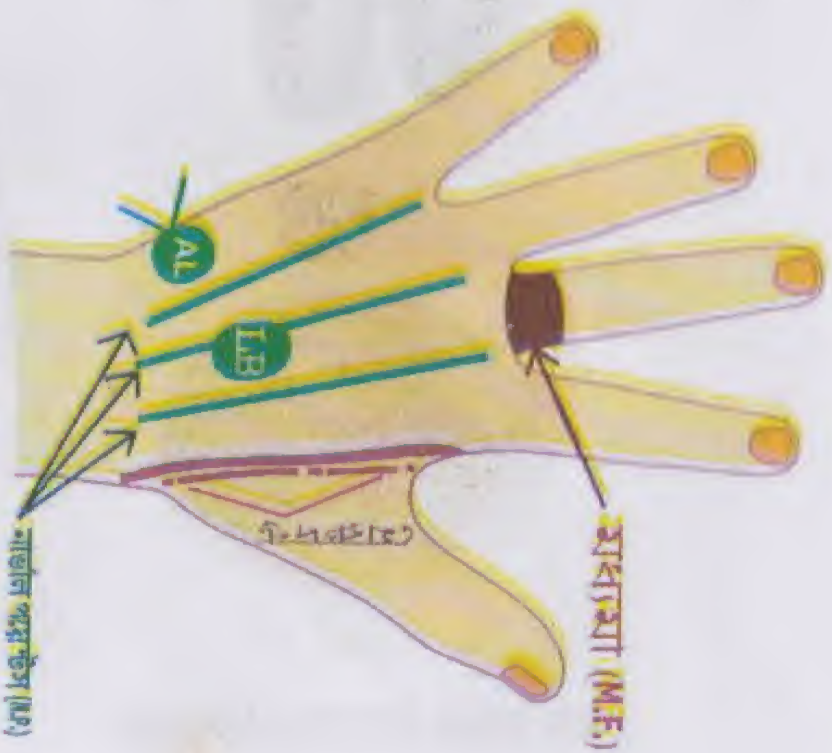


বাম পায়ের বিন্দুসমূহ (চিত্র-১৬)

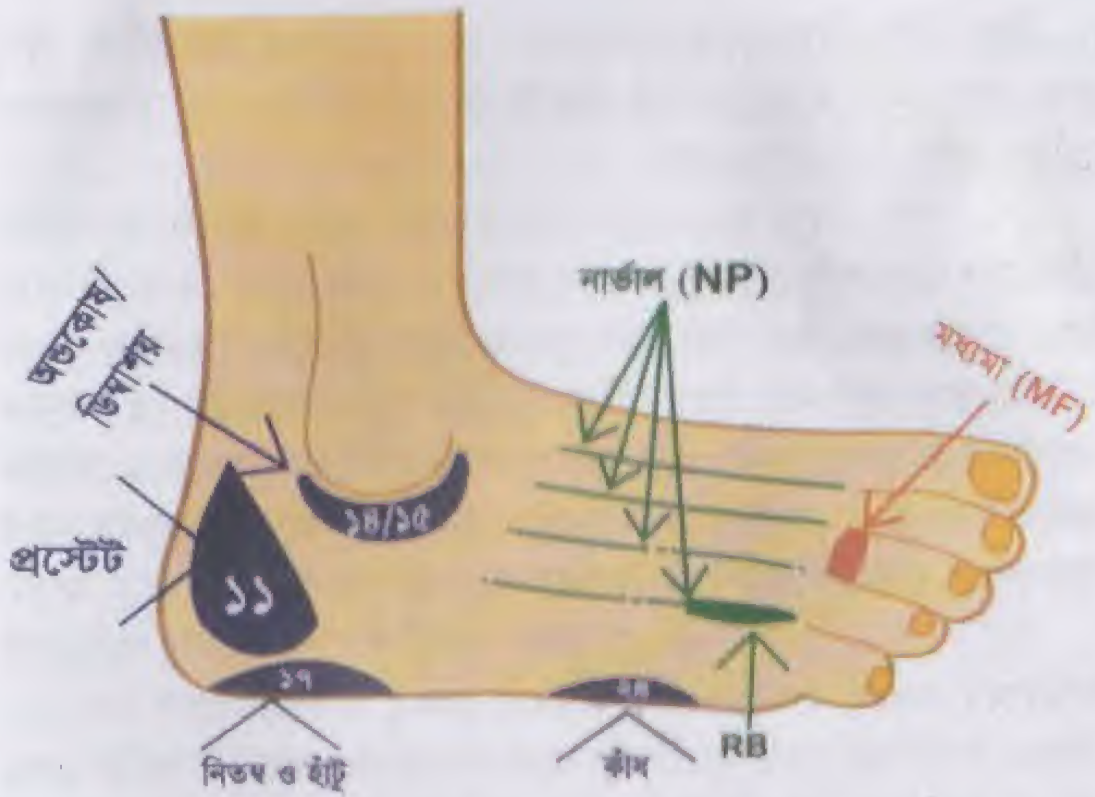
মেরুদণ্ড, চক্ষুর স্নায়ু, স্নায়ু এবং স্তন ইত্যাদি অঙ্গগুলোর বিন্দুগুলো হাতের ও পায়ের তালুর উল্টো দিকে অবস্থিত। এদের অবস্থান নিচের (চিত্র ১৭-২০) চিত্রগুলোতে দেয়া হলো।



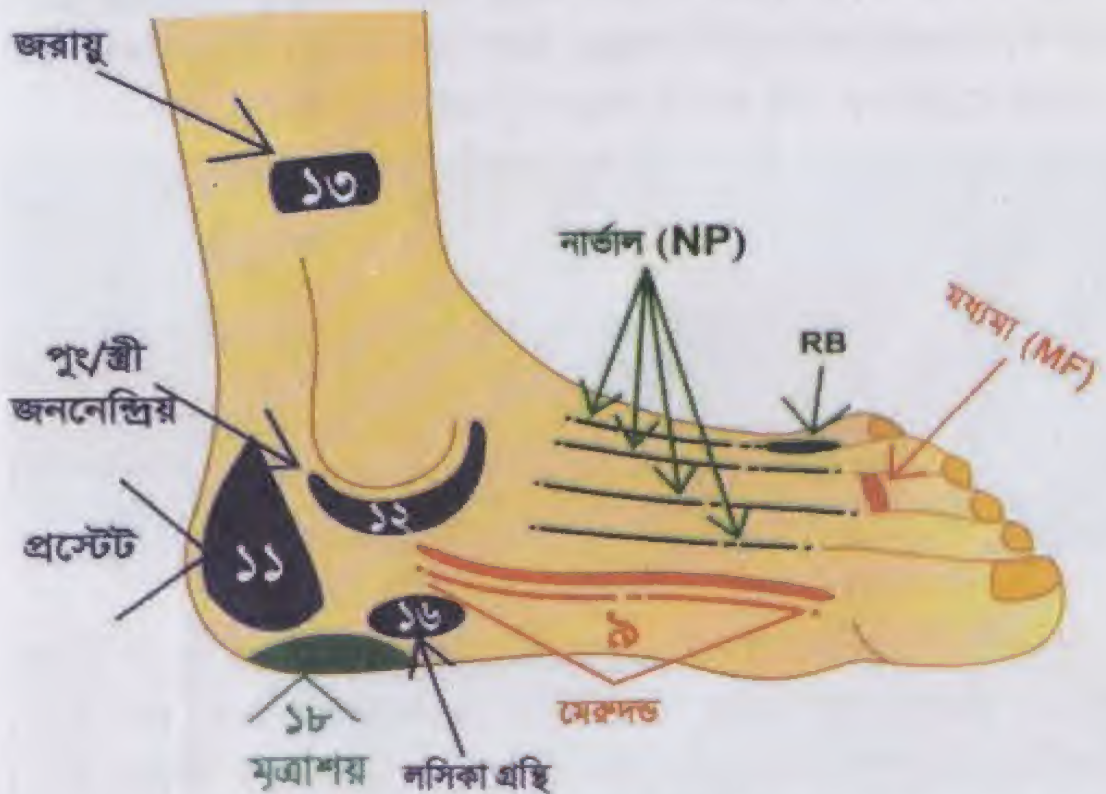
ডান হাতের উল্টো পিঠের বিন্দুসমূহ (চিত্র-১৭)



ডান হাতের উল্টো পিঠের বিন্দুসমূহ (চিত্র-১৮)



পায়ের উপর অংশের (কনিষ্ঠ আঙুলের) দিকে বিন্দুসমূহ (চিত্র-১৯)



পায়ের উপর অংশের (বৃদ্ধাআঙুলের) দিকে বিন্দুসমূহ (চিত্র-১৯)

চিত্রে বর্ণিত বিন্দুগুলোর মধ্যে M.F., N.P., অস্ত্রগুচ্ছ এবং শক্তির বিন্দু ছাড়া সকল অঙ্গ ও গ্রন্থিগুলোর সাথেই আমরা পরিচিত। এ বিন্দুগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

(খ) শক্তি (বিন্দু নং ৩২) : বিন্দ্রি রাত্রি যাপন করলে বা অধিক পরিশ্রমের ফলে শরীরে ক্লান্তি অবসাদ সৃষ্টি হয়। সেই সময় ৩২ নং বিন্দুতে ব্যথা অনুভব হয়। এর অর্থ হলো ঘুম বা বিশ্রামের দ্বারা আমাদের জীবন ব্যাটারি যেমন পূর্ণ চার্জ হয় তা ঠিকমতো হয় নাই। তখন ৩২ নং বিন্দুতে চাপ দিয়ে চিকিৎসা করলে এবং হালকা গরম পানি পান করলে এ চার্জের ঘাটতি পূরণ হয়। তবে স্বাস্থ্যকর পানীয় নিয়মিতো পান করলে ভালো ফল পাওয়া যায় (স্বাস্থ্যকর পানীয়ের বিমাদ আলোচনা পরে আসছে)।

(গ) M.F. ও N.P. বিন্দু : অতিরিক্ত মানসিক চাপ, হতাশা, অনিদ্রা ও অস্থিরতার কারণে মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এ সময় M.F. ও N.P. বিন্দুতে চাপ দিলে ব্যথা হয়। যদি ব্যথা অসহ্য হয়, তবে ঐ ব্যক্তি ভেঙে পড়তে চলছেন। এ অবস্থায় এক হাতের আঙুলগুলো অন্য হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে ২১নং চিত্রের অনুরূপভাবে জড়িয়ে সজোরে চেপে ধরুন। তারপর ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাম হাতের পিছনে এবং বাম হাতের আঙুল দ্বারা ডান হাতের পিছনে দু'মিনিট চাপ দিন।



(চিত্র-২১)



(চিত্র-২২)

পায়ের আঙুলগুলোর মধ্যে হাতের আঙুলগুলো ঢুকিয়ে ২২নং চিত্রের অনুরূপ সজোরে দুই থেকে তিন মিনিট পাম্প করার মতো চাপ দিন। রোগীকে বিছানায় শুয়িয়ে দিন এবং ছয়-সাত ঘণ্টা বিশ্রামে থাকতে দিন। হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া রোগীদের এভাবে চাপ দিলে দ্রুত জ্ঞান ফিরে আসে।

(ঘ) **অন্ত্রগুচ্ছ (বিন্দু-২৯)** : এটি পাকস্থলীর পিছনে মেরুদণ্ডের কটিদেশীয় প্রথম কশেরুকা বরাবর অবস্থিত একগুচ্ছ স্নায়ু। মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রামের নিচে অবস্থিত (যেমন লিভার পাকস্থলী ইত্যাদি) সকল অঙ্গের নিয়ন্ত্রণ হয় অন্ত্রগুচ্ছ দ্বারা। এর আরেক নাম “নাভী চক্র”।

(ঙ) **অন্ত্রগুচ্ছের পরীক্ষা** : সকাল বেলা খালি পেটে সমতোল স্থানে চিৎ হয়ে শুয়ে নাভীর উপর আঙুল দ্বারা চাপ দিলে যদি হৃদকম্পনের মতো অনুভব হয়, তাহলে বুঝতে হবে অন্ত্রগুচ্ছ সঠিক স্থানে আছে। অতিরিক্ত বায়ুর চাপে অথবা অতিরিক্ত ওজন তুললে অন্ত্রগুচ্ছ স্থানচ্যুত হয়। যাদের পাকস্থলী ও লিভারে সমস্যা এবং পিণ্ডের দোষ আছে তাদেরও অন্ত্রগুচ্ছ সঠিক স্থানে থাকে না। এ অবস্থা স্পন্দন নাভীর মধ্যে না হয়ে আশে পাশে হয়।

(চ) **অন্ত্রগুচ্ছ সরে গেলে কি কি সমস্যা হয় :**

১। অন্ত্রগুচ্ছ উপরে সরে গেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। দীর্ঘদিনের কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলে অম্ব; মলদ্বারে গ্যাজ এমন কি মলাশয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়।

২। অন্ত্রগুচ্ছ নিচে সরে গেলে পাতলা পায়খানা উদরাময় ঘটায়। ওষুধ দ্বারা এর নিরাময় সম্ভব নয়।

৩। মেয়েদের তলপেটে ব্যথা হয়।

দীর্ঘদিন অন্ত্রগুচ্ছ সঠিক স্থানে না থাকলে বুকে পিঠে ব্যথা হতে পারে যাকে হৃদযন্ত্রের ব্যথা বলে অনেক সময় ভুল করা হয়।

(ছ) **অন্ত্রগুচ্ছের অন্যান্য পরীক্ষা ও ঠিক করার উপায় :**
প্রথম পরীক্ষা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। দু’হাত শরীরের দু’পাশে সোজা করে রাখুন। ২৩নং চিত্র অনুযায়ী পায়ের আঙুলিগুলো খাড়া



(চিত্র-২৩)

করে উপরের দিকে রাখুন। যদি উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল বরাবর থাকে তবে অস্ত্রগুচ্ছ সঠিক আছে। যদি বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটি ছোট বড় হয় তাহলে অস্ত্রগুচ্ছ সঠিক স্থানে নেই।

রোগীকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে বলুন, হাত দুটি শরীরের দু'পাশে সোজা করে রাখুন।

অনুযায়ী আপনি এক হাতে পায়ের গোড়ালিতে চাপ দিয়ে অপর হাত দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুল দুটি সমান করে ধরে উপরের দিকে টান দিন। এ পদ্ধতি কয়েক বার পুনরাবৃত্তি করেন যতক্ষণ উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী বরাবর না হয়।

দ্বিতীয় পরীক্ষা চিত্র নং-২৪ এ যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে হাতের তালু দুটি পাশাপাশি রেখে ১নং রেখাগুলি মিলান। যদি ৪নং রেখা গুলো মিলে যায় তবে অস্ত্রগুচ্ছ সঠিক আছে। যদি ৪নং রেখাগুলো না মিলে তাহলে অস্ত্রগুচ্ছ সঠিক স্থানে নাই।



(চিত্র-২৪)



(চিত্র-২৫)

চিত্র নং ২৫ এর মতো আপনার ডান হাতের তালুটি বাম হাতের কনুই এর জোড়ায় উপরে রেখে সেখানে চেপে ধরুন। তারপর এক ঝাঁপটায় বাম হাতটি উপরে তুলে বৃদ্ধাঙ্গুলটি কাঁধ স্পর্শ করার চেষ্টা করেন। একই ভাবে ডান হাতেও করুন। এ প্রক্রিয়াটি প্রতিদিন সকাল বেলা খালি পেটে পাঁচ বার করে করুন।

অত্যধিক গ্যাসের কষ্ট হলে অথবা অস্ত্র দুর্বল হলে অস্ত্রগুচ্ছ ঠিক করলেও বার বার সেরে যায়। এক্ষেত্রে চিত্র নং ২৬ এর অনুরূপ উভয়

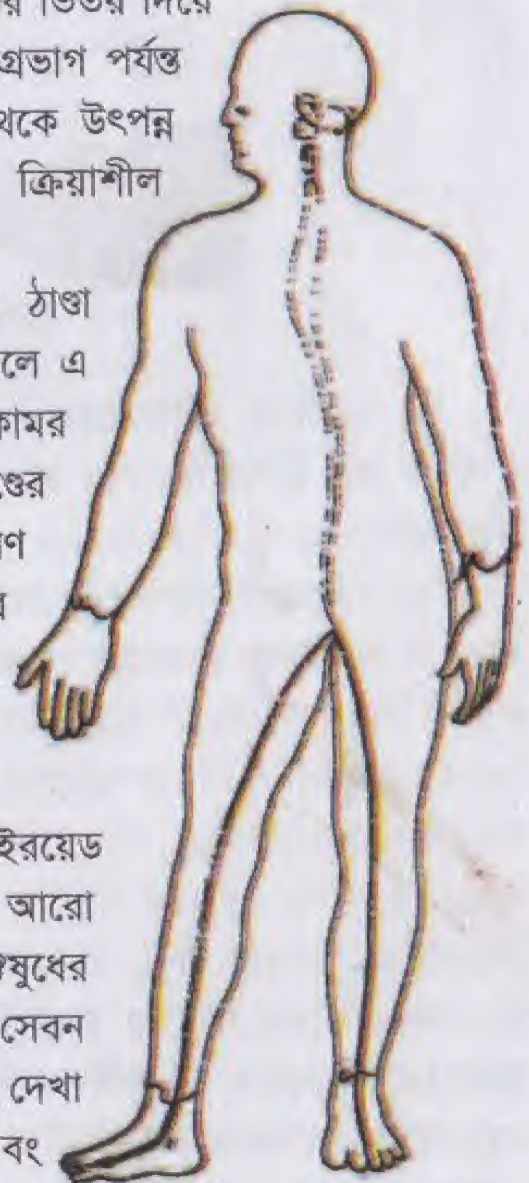


(চিত্র-২৬)

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে সেলাই সুতার চেয়ে একটু মোটা সুতা হালকাভাবে সাত আট পাক পেঁচিয়ে গিট দিয়ে রাখুন। তিন দিন রেখে দিলে অল্পগুচ্ছ ঠিক হয়ে যাবে। তবে, অত্যধিক ব্যথা হলে খুলে ফেলুন।

(জ) সাইটিকা স্নায়ু : মস্তিষ্ক ও সুষুন্মাকাণ্ড থেকে সৃষ্ট টেলিফোন ক্যাবলের ন্যায় এক গুচ্ছ স্নায়ু মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে এসে দু'পায়ের মধ্যে দিয়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র-২৭)। আবার মেরুদণ্ড থেকে উৎপন্ন স্বল্প দৈর্ঘ্যের স্নায়ু শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল অংশের সাথে যুক্ত।

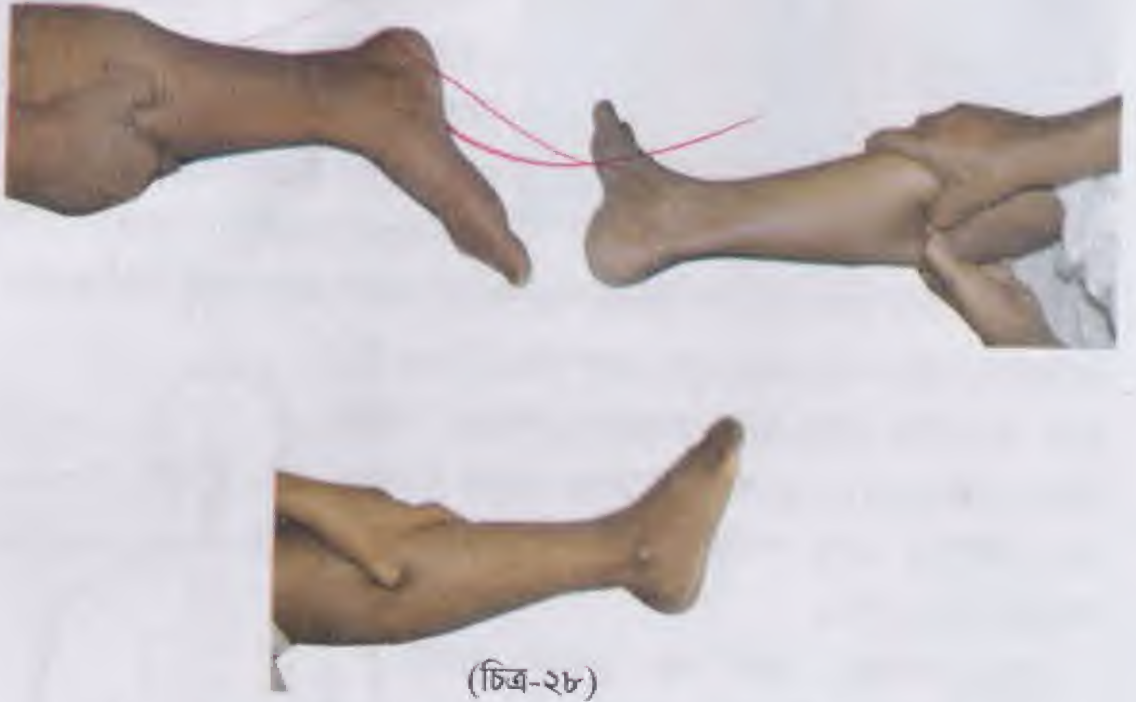
ধাক্কা লাগলে, ভারী বস্তু তুললে, ঠাণ্ডা লাগলে অথবা উঁচু হিলোযুক্ত জুতা পড়লে এ স্নায়ুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে হাটু কোমর এবং গৌড়ালিতে ব্যথা হয় কিন্তু মেরুদণ্ডের কোনো ক্ষতি হয় না। ব্যথার মূল কারণ এক্সেরেও ধরা পড়ে না। যারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন তাদের অধিকাংশই এ সাইটিকা স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন।



(চিত্র-২৭)

সাইটিকা সমস্যার সাথে যদি থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে অবস্থা আরো জটিল হয়। রোগীকে বেদনানাশক ঔষুধের সাথে বাড়তি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট সেবন করতে হয়। অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিক বেদনানাশক বড়ি এবং ক্যালসিয়াম সেবনের ফলে কিডনি

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু আকুপ্রেসার চিকিৎসার মাধ্যমে খুব সহজেই এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।



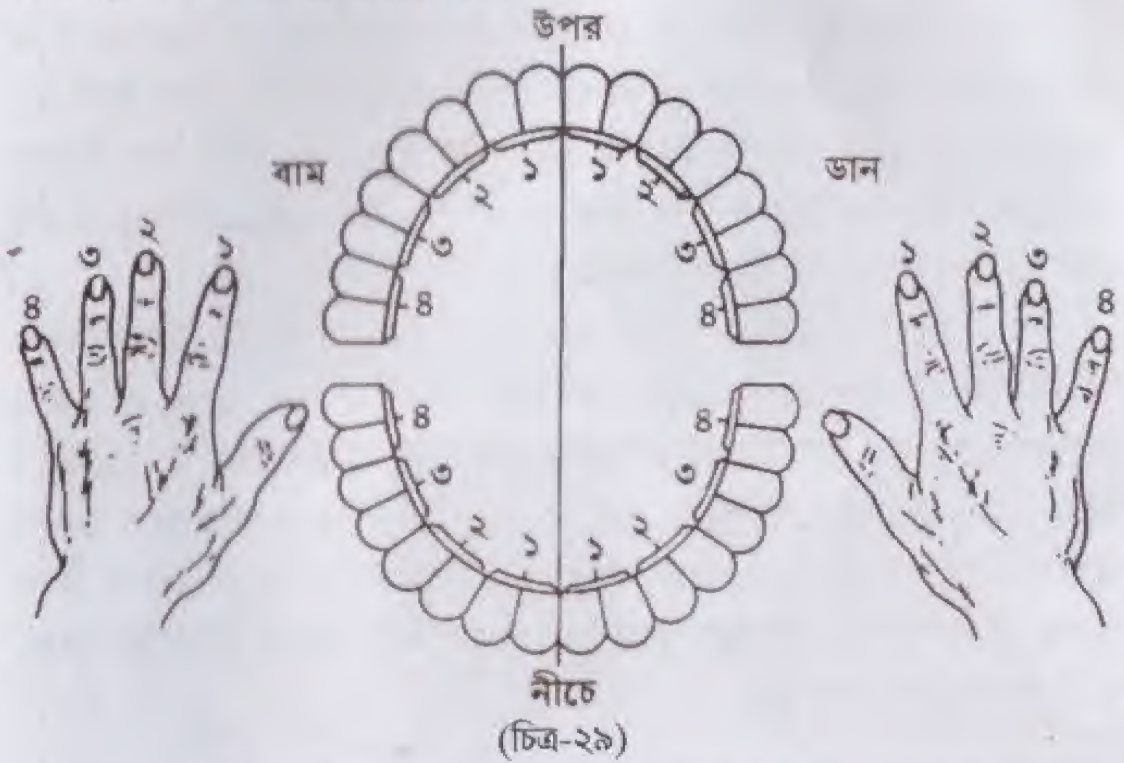
(চিত্র-২৮)

২৮ নং চিত্রে বর্ণিত রেখা বরাবর প্রতি দিন দু'বার প্রতিটি রেখায় দু'মিনিট করে চিকিৎসা করলে অল্প কয়দিনের মধ্যে সাইটিকা জনিত সমস্যা সেরে যায়।

(ঝ) **দাঁতের চিকিৎসা** : আল্লাহ তায়ালা আমাদের খাদ্য চিবিয়ে খাওয়ার জন্য দাঁত দিয়েছেন। কোনো খাদ্যগ্রহণের সময় ১০ থেকে ১২ বার চিবিয়ে খাওয়া উচিত। এতে করে পাকস্থলীর উপর অর্ধেক চাপ পড়বে। প্রত্যেক বার খাদ্য গ্রহণের পর দাঁতের আটকে যাওয়া খাবার বের করার জন্য খেলাল করা এবং সামান্য লবণ চিবিয়ে পানি দ্বারা গার্গেল করা বা কুলি করা উচিত। এতে গলা ও দাঁত পরিষ্কার হয়।

দাঁতের গোড়ায় ব্যথা, দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়ায় পুজ হওয়া ইত্যাদি যে কোন দাঁতের সমস্যার জন্য দাঁতের ক্রম অনুসারে নির্দিষ্ট আঙ্গুলের অগ্রভাগে খাড়াভাবে দুই থেকে তিন মিনিট বিরামহীন চাপ দিলে উপশম হয়। স্থায়ী নিরাময়ের জন্য নিয়মিত কয়েকদিন চিকিৎসা করতে হয়। দাঁতে গোড়ায় ঘা থাকলে এর সাথে ১৬ নং বিন্দুতে চাপ দিতে হয়।

দাঁতের সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই হজমের গোলযোগ এবং পিত্তের দোষের কারণে হয়। সেক্ষেত্রে এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হজম শক্তি বৃদ্ধির চিকিৎসা এবং ২২নং বিন্দুতে চাপ দিতে হবে। প্রতিবেলা খাওয়ার পরে দুটি লবঙ্গ চিবিয়ে খেতে হবে।



২৯ নং চিত্রে দাঁতের ক্রমের সাথে আঙ্গুলের ক্রম দেখানো হয়েছে। মধ্যরেখার ডান পার্শ্বের উভয় পাটির দাঁতের ক্রম ডান হাতের সাথে এবং বাম পার্শ্বের উভয় পাটির দাঁতের ক্রম বাম হাতের সাথে সম্পর্কিত।

(ঞ) চুলের যত্নে আকুপ্রেসার : চুল উঠা অল্প বয়সে চুল পাকা বর্তমান সমাজে একটি বিরাট সমস্যা। নিয়মিত আকুপ্রেসার চিকিৎসা চালিয়ে গেলে












যেমন চুল উঠা বন্ধ হয় এবং চুলপাক ধরার সময় এই চিকিৎসা নিয়মিত করলে চুল পাক বিলম্বিত হয় এবং চুল অনেক দিন কালো থাকে।





দুই হাতে শাহাদাৎ আঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত এই আটটি আঙ্গুল ৩০নং চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে সকালে পাঁচ মিনিট ও বিকালে পাঁচ মিনিট ঘষলে অথবা যে কোন সময় একাধারে দশ মিনিট ঘষলে চুল উঠা বন্ধ হয় এবং চুল পাকা বিলম্বিত হয়।







অনেক সময় পিত্তাধিক্য ও যৌন সমস্যার কারনেও এই সমস্যা হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে উপরের চিকিৎসার সাথে পিত্তাধিক্যের কারন হলে ২২ ও ২৩ নং বিন্দুতে চিকিৎসা করুন এবং (ঔষ্ঠায়) যে ভাবে বলা হয়েছে সে ভাবে দেহের অতিরিক্ত তাপ বের করে দিন। আর যৌন সমস্যার কারণ হলে ১১ থেকে ১৫ নং বিন্দুতে নিয়মিত চিকিৎসা করুন।

(ট) প্রতিটি বিন্দুর আলাদা আলাদা অবস্থান : নিচের চিত্রগুলোতে পতিটি বিন্দুর আলাদা আলাদা অবস্থান দেখানো হল এবং ব্যতিক্রম বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে চাপ দেওয়ার পদ্ধতি সহ দেখানো হল (চিত্র ৩১-১১৪)। উল্লেখ্য যে, হাতের ১নং হতে ৭নং, ১৭নং, ২৪নং ও ৩১নং হতে ৩৫নং এবং পায়ের ক্ষেত্রে ১নং হতে ৭নং, ১১নং হতে ১৫নং ও ৩১নং হতে ৩৫নং বিন্দুগুলোতে বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা চাপ দিতে হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে সেফা কাঠি ব্যবহার না করা ভাল।






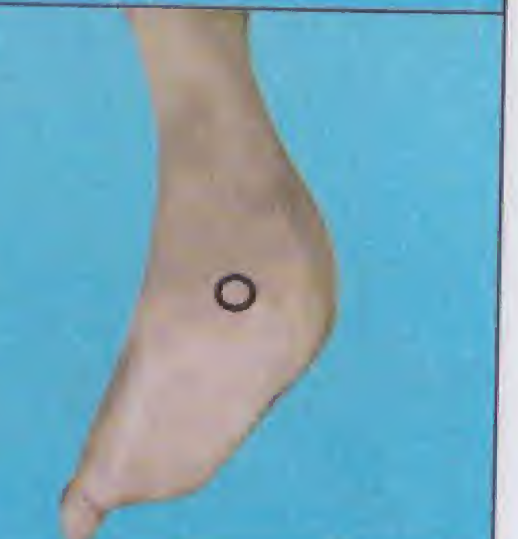
বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
১ মস্তিস্ক		
২ মাথার স্নায়ু		
৩ পিটুইটারী গ্রন্থি		







বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
৪ পিনিয়ল গ্রন্থি		
৫ মস্তিস্কের শিরা		
৬ গলা		







বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
৭ ঘাড়		
৮ ধাইরয়েড গ্রন্থি		
৯ মেরুদন্ড		

বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
১০ অশ্ব		
১১ পোস্টেট গ্রন্থি		
১২ পুংস্রী জননেন্দ্রীয়		

বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
১৩ জরায়ু		
১৪ ডিম্বাশয়		
১৫ অভ্যকোষ		







বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
১৬ লসিকা গ্রন্থি		
১৭ নিতম্ব ও হাটু		
১৮ মূত্রথলি		

বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
১৯ ক্ষুদ্রান্ত		
২০ মলদার		
২১ এপিভিসাইড		







বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
২২ পিত্তথলি		
২৩ যকৃত		
২৪ কাঁধ		







গুধু ডান হাত ও ডান পায়ে







গুধু ডান হাত ও ডান পায়ে

বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
২৫ অগ্নাশ্যয়		
২৬ কিডনি		
২৭ পাকস্থলি		

বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
২৮ এড্রিনাল গ্রন্থি		
২৯ অস্ত্রগুচ্ছ		
৩০ ফুস ফুস		

বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
৩১ কান		
৩২ শক্তি		
৩৩ কানের স্নায়ু		

বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
৩৪ ঠাণ্ডা		
৩৫ চোখ		
৩৬ হৃৎপিণ্ড		

বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
৩৭ পুহা	 <p>গুধু বাম হাত</p>	 <p>গুধু বাম পা</p>
৩৮ থাইমাস গ্রন্থি		
N.P.		

বিন্দুর নাম ও নম্বর	হাতে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান	পায়ে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থান
M.F.		
R.B.		
L.B.		

তৃতীয় অধ্যায়

আকুপ্রেসারের সাহায্যে মানবদেহের পরিচর্যা

৩.১ শিশুর পরিচর্যা :

প্রতিটি শিশুই উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে সুন্দর স্বাস্থ্য ও উন্নত চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন হতে পারে। শিশু পরিচর্যা মূলত গর্ভ কালীন সময় হতেই শুরু করা দরকার।

(ক) গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা :

- ১। গর্ভস্থ শিশুর যথাযথ বিকাশের জন্য গর্ভবতী মায়ের প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। এই সকল ক্যালসিয়াম ও খনিজ পদার্থ হজমের জন্য থাইরয়েড/প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থি ঠিকমত কাজ কর দরকার। এজন্য গর্ভাবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থিতে নিয়মিত চিকিৎসা করা দরকার। উল্লেখ্য যে দুধ, কলা, টাটকা শাক-সবজি, ফল ও ছোট মাছ ইত্যাদিতে ক্যালসিয়াম ও খনিজ লবণ পাওয়া যায়।
- ২। যে সমস্ত গর্ভবতী মা যে কোন কারণে বেশি উত্তেজনায় ভোগেন, তাদের গর্ভস্থ সন্তান জন্মের পর পরই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ৩। গর্ভবতী মা যদি সাইনাস, মাংস কিংবা সর্দি ইত্যাদিতে ভোগেন এবং কোন চিকিৎসার দ্বারা এই গুলোকে চাপা দেয়া হয় তবে গর্ভস্থ শিশুর কানের ক্ষতি হয়। এমনকি শিশুটি জন্ম বধির হতে পারে।
- ৪। এই সময় অশ্ব, হজমের গোলযোগ, উদারাময়, হাঁটু ও কোমর ব্যাথা, উচ্চ রক্তচাপ ও মাথাব্যথা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেকের রক্ত স্বল্পতাও দেখা দেয়। এই বই এর শেষের দিকে বর্ণিত উপরোক্ত সমস্যাগুলোর চিকিৎসা নিয়মিত চালিয়ে গেলে এইসব

সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

৫। এই সময় হ্যান্ড রোলার ও ফুট রোলার নিয়মিত দিনে দু'বার ব্যবহার করা উচিত।

৬। সপ্তাহে অন্তত এক বার অন্ত্রগুচ্ছ পরীক্ষা করে, সঠিক স্থানে না থাকলে ঠিক করে নেওয়া উচিত।

এই সময় হাতের তালু ও পায়ের তালুর প্রতিটি বিন্দুতে প্রতিদিন দশ মিনিট চিকিৎসা চালালে গর্ভবতী মায়ের অনেক জটিল সমস্যা থেকেই রক্ষা পেতে পারেন এবং সেই সাথে আগত শিশুটি সুস্থ ও সবল হবে ইনশাআল্লাহ।

(খ) শূন্য থেকে ৮ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত শিশুর পরিচর্যা : জন্মের পর থেকে আট বছর বা তদুর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত শিশুর ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত কাজগুলো নিয়মিত করলে শিশু সুস্থ থাকবে এবং সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে ইনশা-আল্লাহ।

১। জন্মের পর থেকে এক বছর পর্যন্ত প্রতিদিন দুই থেকে তিন মিনিট দু'পায়ের তালু টিপবেন।

২। তারপর থেকে আট বছর পর্যন্ত প্রতিটি হাতের তালু ও পায়ের তালুর বিন্দুগুলোতে (সব মিলে) চার থেকে পাঁচ মিনিট চাপ দিন। কোন বিন্দুতে ব্যথা থাকলে সহজেই রোগ নির্ণয় করে চাপ দিয়ে ঐ রোগের চিকিৎসা করুন।

৩। অন্ত্রগুচ্ছ একদিন পরপর পরীক্ষা করুন প্রয়োজনে ঠিক করে দিন।

৪। এর পর তাকে শিখান কিভাবে চাপ দিতে হবে এবং প্রতিদিন চার-পাঁচ মিনিট করে চাপ দেওয়ার অভ্যাস করাবেন।

৫। সপ্তাহে একদিন সকালে খালি পেটে সামান্য হরিতকি চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করে সেবন করান।

৬। দুই এক বেলা না খেয়ে থাকলে কোন শিশুই মারা যায় না কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়ালে হজমের গোলযোগ হয় এবং নানা প্রকার রোগ জন্ম নেয়।

৭। শিশুদের ঠাণ্ডা পানীয়, আইসক্রীম, চকলেট, আচার, চাটনী ইত্যাদি খাবারের প্রতি আকর্ষণ বেশি। আত্মীয় স্বজনরাও এই জাতীয় খাবার

বেশি কিনে দেন। এইগুলোর ক্ষতিকারক দিকের কথা চিন্তা করেন না। এই সব খাবারের ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষার জন্য দিনে ২/৩ বার হালকা গরম পানি পান করতে দেয়া উচিত।

৩.২ মহিলাদের পরিচর্যা :

আল্লাহ তায়ালা নারী জাতিকে মা হওয়ার বাড়তি দায়িত্ব দিয়েছেন। মাকে বলা হয় বাচ্চার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাদের একদিকে ঘর গোছানো কাজ, অন্য দিকে শিশুর যত্ন নেওয়ার শিক্ষা থাকা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য, শান্ত্যাব ও সদা হাসি মুখে থাকা। আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরাই বিভিন্ন যৌন সমস্যা যেমন মাসিকের সমস্যা, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, শ্বেত প্রদর ও জরায়ুর সমস্যা ইত্যাদি রোগে ভোগেন। ফলে তাদের প্রায়ই রক্ত স্রাবতা, ভীকতা, যৌন শীতলতা, স্নায়ুবিধ দূর্বলতা, অবসাদ ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয় এবং তাদের স্বভাবের মধ্যে ক্ষীণতা, খিট-খিটে মেজাজ ও বিষন্নতা দেখা যায়। আকুপ্রেসার চিকিৎসা নিয়মিত চালিয়ে গেলে এই সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব এবং তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা উত্তরোত্তর ভাল হতে থাকবে ইনশআল্লাহ।

মেয়েরা যদি ছয় সাত বছর থেকেই প্রতিদিন প্রতিটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে এবং ১২ থেকে ১৪ নং বিন্দুতে নিয়মিত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারে, তবে তাদের স্বভাব হবে কোমল, ব্যবহার হবে আকর্ষণীয় এবং তারা সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন উপভোগ করতে পারবে এবং তাদের রূপচর্চার জন্য বাড়তি প্রসাধনীর প্রয়োজন হবে না।

মেয়ের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত সমস্যাগুলো অধিকহারে দেখা যায় :

(ক) মাসিকের সমস্যা : নির্দিষ্ট বয়সের পূর্বে মাসিক হওয়া, অনিয়মিত মাসিক, যন্ত্রণাদায়ক রক্তস্রাব, কম বা



(চিত্র-১১৫)

অতিরিক্ত রক্ত স্রাব এবং মাসিকের আগে, মাসিকের সময় বা মাসিকের পরে কোমরে ব্যথা ইত্যাদি সমস্যাগুলো মাসিকের প্রধান সমস্যা। এই সকল সমস্যার ক্ষেত্রে সমস্ত গ্রন্থিগুলো এবং ১২ থেকে ১৪ নং বিন্দুতে নিয়মিত চিকিৎসা চালিয়ে গেলে দুই-তিন মাসের মধ্যেই মাসিক নিয়মিত হবে এবং সমস্ত সমস্যা দূর হবে।

অতিরিক্ত রক্ত স্রাবের ক্ষেত্রে উভয় পায়ে বৃদ্ধাঙ্গুলের গোড়ায় (চিত্র-১১৫) তিন থেকে পাঁচ মিনিট রাবার ব্যান্ডেজ লাগিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে আধাঘন্টা পরপর কয়েক বার এ রকম করতে হবে।

(খ) শ্বেত-প্রদর (Leucorrhoea) : শরীরের উত্তাপ অধিক হলে, কিংবা যৌন গ্রন্থি বিকার হলে ডিম্বরস পাতলা হয়, এই রস যোনি পথে অনবরত শরীর থেকে বেরিয়ে যায় একে শ্বেত-প্রদর বলে। বইয়ের ৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত উপায়ে শরীরের বাড়তি উত্তাপ বের করে দিন। ১২ থেকে ১৪ নং বিন্দুতে চিকিৎসা করলে শ্বেত-প্রদর রোগের উপকার হয়। তাছাড়া ২ ইঞ্চি ব্যাসের একটি রাবার বল যোনি ও মলদারের মাঝে রেখে একটি কাঠের চেয়ারে প্রতিদিন ১০ মিনিট বসে থাকলে কয়েক দিনের মধ্যে এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। পুরুষরা এই প্রক্রিয়া অনুশীলন করলে তাদের মাত্রা-অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা প্রশমিত হয়।

(গ) রজোগ্রন্থি : সাধারণত মহিলাদের ৪৫ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে রজঃস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যে সব মহিলারা আবেগ প্রবন, কর্ম ব্যস্ততা কম এবং সংসারের জন্য খুব বেশি চিন্তা করতে হয় না তাদের ৪০ বৎসরের মধ্যেই এই সমস্যা দেখা দেয়। ফলে মহিলাদের মধ্যে দুর্বলতা, ভীর্ণতা, নিশ্বেজ ভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো এবং ১২ থেকে ১৪নং পর্যন্ত বিন্দুগুলো প্রয়োজন হলে অন্যান্য বিন্দুতে নিয়মিত চাপ দিলে এই সমস্যা দূর হয় এবং মাসিকের পরিব্যাপ্তি কাল আরও প্রসারিত হয়। এর ফলে দাম্পত্য জীবনের সুখ ও আনন্দ আরও দীর্ঘায়িত হয়। ৪০ বছর বয়সের পর থেকে প্রত্যেক মহিলারাই এই চিকিৎসা নিয়মিত করা উচিত।

(ঘ) জরায়ুর সমস্যা : বিভিন্ন অনিয়ম ও অবহেলার কারণে মহিলাদের দু-একটি সন্তান প্রসবের পর জরায়ু স্থানচ্যুতি, জরায়ুর মুখে প্রদাহ,

জরায়ুতে টিউমার এবং জরায়ু ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হয়। আজকাল এই রোগটি ব্যাপক হারে দেখা দিচ্ছে। ১৩নং বিন্দুতে নিয়মিত চিকিৎসা চালিয়ে গেলে এই সকল রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যদি ১৩ নং বিন্দুর সাথে ১৬নং বিন্দুতে ব্যথা থাকে তবে অবস্থা অবনতির দিকে। ইহা জরায়ু ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ। দুই-তিন মাস নিয়মিত চিকিৎসা করলে এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(৬) স্তনের সমস্যা : সন্তান দুধ পান না করার কারণে দুধ স্তনে জমে গিয়ে স্তনে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়া, স্তনে ফোলা, স্তনে টিউমার এবং স্তনে ক্যান্সার ইত্যাদি সমস্যা হলে হাতে উল্টা দিকে (L.B বা R.B) বিন্দুতে চাপ দিলে বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। স্তনে বিন্দুর সাথে ১৬ নং বিন্দুতে ব্যথা স্তনে ক্যান্সারের পূর্বাভাস।

৩.৩ পুরুষের পরিচর্যা :

যৌন গ্রন্থির ভারসাম্যহীন বৃদ্ধি এবং এর ফলে শারীরিক ও মানসিক যে সকল সমস্যা হয়, সেগুলোই হল পুরুষের সমস্যা। সাধারণত ১০ বছর বয়স হতে ছেলেদের যৌন গ্রন্থিগুলো বিকশিত হতে শুরু করে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে। এই সময় যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন গুলো হয়, তার জ্ঞান অর্জন করলে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এই বয়সের উৎশ্খল জীবন যাপনের জন্য বিবাহ পরবর্তী কম উত্তেজনা, পরিতৃপ্তির অভাব ও দ্রুত বীর্যপাত ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

ছেলেরা যদি ছয় সাত বছর বয়স থেকেই প্রতিদিন নিয়মিত প্রতিটি অন্তক্ষরা গ্রন্থি ও ১১, ১২ ও ১৫ নং বিন্দুতে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারে তাহলে যৌবনারম্ভের সমস্ত সমস্যা যেমন হস্ত মৈথুন, কর্তব্যে অবহেলা এবং শারীরিক ও মানসিক সমস্যা প্রভৃতি এড়ানো সম্ভব এবং সেই সাথে তাদের চারিত্রিক, মানসিক ও শারীরিক অবস্থা দিন দিন উন্নত হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

উঠতি বয়সের যুবকরা তাদের যৌন সমস্যা গোপনে ভোগে। খোলা খুলি ভাবে প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করে। ছেলেদের ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নের সমস্যাগুলো দেখা দেয় :

১. স্বপ্ন দোষ : ১৭/১৮ বছর বয়সে স্বপ্নে কখনো বীর্যপাত হলে কোন দোষ নাই। কিন্তু এর পূর্বে অথবা নিয়মিত হলে এর চিকিৎসার প্রয়োজন।

২. কম উত্তেজনা : পরিতৃপ্তির অভাব/ দ্রুত বীর্যপাত, বীর্যরস পাতলা ইত্যাদি। এই সব সমস্যার মূল কারন হতে পারে বিবাহ পূর্ব হস্তমৈথুন, পোস্টেট গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অথবা দেহে তাপের আধিক্য।

৩. ক্রিম্যাকটারি : যৌবনে যারা বিভিন্ন যৌন সমস্যায় ভোগেন তাদের অনেকের ৪০-৫০ বছর বয়সের পর শুক্র উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং যৌন ইচ্ছা একে বারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ইহা পরুষের জন্য মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধের সমান অবস্থা।

এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ১১, ১২ ও ১৫ নং বিন্দুতে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। দেহের বাড়তি উত্তাপ বের করে দেয়ার জন্য বইয়ের (৯০ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত চিকিৎসা করতে হবে। ৩ চামুচ মধু ও তিন চামুচ পেয়াজের রস একত্রে মিশ্রিত করে তিন দিন সকালে খালি পেটে পান করুন। এই তিন দিন স্বামী-স্ত্রী পৃথক থাকুন। এর ফলে প্রচুর পরিমাণ শুক্রানু উৎপন্ন হবে এবং বীর্যরস ঘন হয়।

৩.৪ নব দম্পত্তির পরিচর্যা :

১. বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি সকল গ্রন্থিগুলো নিয়মিত ৩-৪ মাস চিকিৎসা করেন তাহলে বংশ গত রোগ থেকে পরবর্তী প্রজন্ম রক্ষা পেতে পারে।
১. স্বামী স্ত্রী উভয়ে যদি ৬ মাস ১১ থেকে ১৫নং বিন্দুতে নিয়মিত চিকিৎসা করেন, তবে বন্ধ্যা দম্পত্তির সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩.৫ বার্ধক্য বয়সের পরিচর্যা :

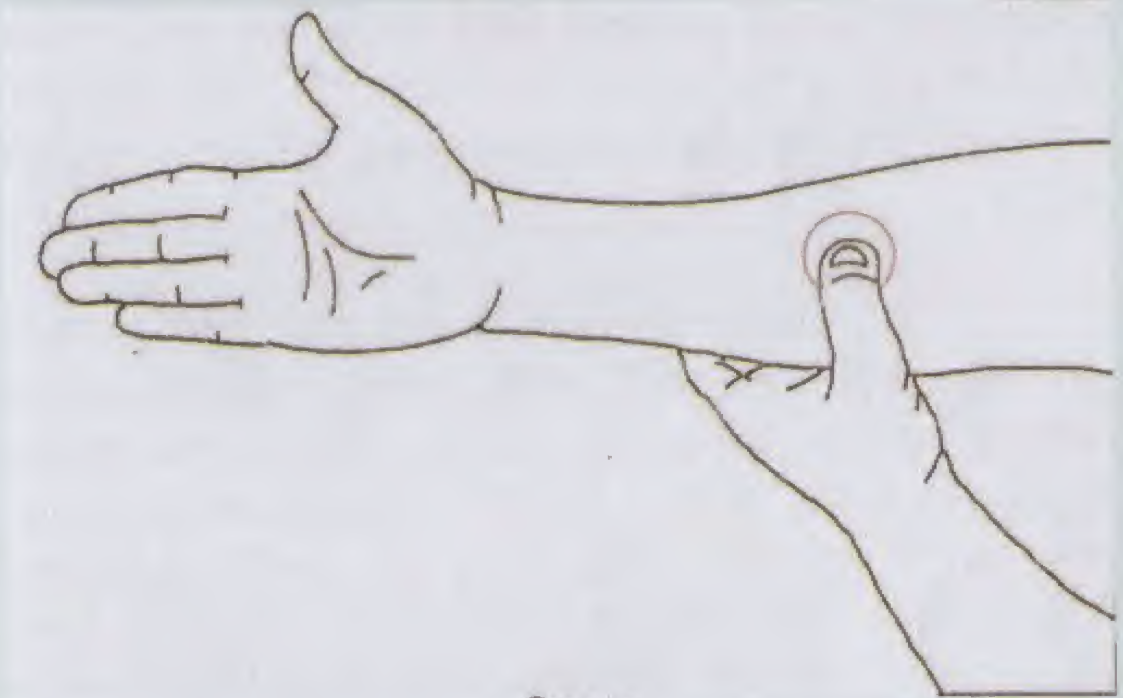
আমাদের দেশে সাধারনত ৪০ বছর বয়সের পর থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শিথিলতা দেখা দেয়, সেই সাথে বিভিন্ন প্রকার রোগব্যধী শরীরে বাসা বাধে। এজন্য এই বয়সে নিয়মিত আকুপ্রেসার চিকিৎসা চালিয়ে গেলে বিভিন্ন রোগব্যধী থেকে মুক্তি পাওয়া এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তি ধরে রাখা যেতে পারে।

১. চোখের বিন্দু ও চোখের স্নায়ু বিন্দুতে নিয়মিত চিকিৎসা চোখের ছানি পড়া থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।
২. পোস্টেট গ্রন্থির বিন্দু ১১ ও ১৫ নং বিন্দুতে নিয়মিত চিকিৎসা করলে বার্ধক্য জনিত দুর্বলতা এবং হার্নিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

৩. ডাক্তারী মতে ষাট বছর বয়সের পর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন হাঁট লিভার ইত্যাদি মল্লুর হয়ে পড়ে। এই সময় রাত্রে ভারী খাবারের পরিবর্তে হালকা খাবার গ্রহণ করা, কাঁচা শাক সবজির রস, ফলের রস, সালাদ ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করাই শ্রেয়। এই সময় হালকা ব্যায়াম, সাঁতার কাটা, হাটা ইত্যাদি অবশ্যই দরকার।

৩.৬ দেহের তারুণ্য বজায় রাখা :

৪০ বছর বয়সের পর শরীরের বিদ্যুৎ প্রবাহ ডান হাতের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। এজন্য ডান কুনই ও কজির মাঝখানে (চিত্র-১১৬) এক ইঞ্চি মাপের বৃত্তের বিন্দুতে চিত্রানুসারে ২ মিনিট বিশ্রামহীন ভাবে প্রতিদিন চাপ দিলে দেহ থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ক্ষরন নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এতে দেহ ও



চিত্র-১১৬

মনের তারুণ্য অনেক দিন বজায় থাকবে এবং বার্ধক্য দেরীতে আসবে। প্রত্যেক নারী পুরুষের এই চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

সুস্থ থাকার উপায়

পাকস্থলী ও ফুসফুস ছাড়া শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ ঠিক মত পেলে নিজে নিজেই কাজ করে। তা ছাড়া অধিকাংশ রোগ জীবানুই শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ ফুসফুস এবং খাদ্য ও পানীয় অর্থাৎ পাকস্থলীর মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এজন্য সুস্থ শরীর লাভের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং হজম ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

৪.১ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া

(ক) শ্বসন : ইঞ্জিনের অব্যাহত গতির জন্য যেমন শক্তির প্রয়োজনে তেমনভাবে প্রাণিদেহের প্রতিটি সজীব কোষের খাদ্যরসের যাবতীয় জৈবক্রিয়া সম্পাদনের জন্যও শক্তির প্রয়োজন। ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে জ্বালানীর দহনের ফলে এ শক্তি উৎপন্ন হয় আর প্রাণি তার কোষে অবস্থিত খাদ্যকে দহন করে শক্তি নির্গত করে। কোষে সঞ্চিত খাদ্য ও অক্সিজেন রসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তাপ শক্তি উৎপন্ন করে। এই তাপ শক্তিই দেহের প্রাণ শক্তি নামে পরিচিত এবং এ ক্রিয়া শ্বসন নামে পরিচিত।

বায়ু যখন নাকের মধ্যে দিয়া প্রবেশ করে, তখন বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা ও রোগজীবানু নাকের লোম ও তেল জাতীয় পদার্থে আটকে যায়। তাছাড়া নাসাবন্ধ অতিক্রম করার সময় বায়ু কিছুটা গরম এবং আর্দ্র হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। অপর দিকে শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস (Toxin) যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসে অবস্থিত অসংখ্য নালীর মধ্য দিয়ে

রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে দেয়। এই পরিশোধিত রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে যায়, এজন্য সুস্থ শরীরের জন্য ফুসফুসের ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। আর ফুসফুসের ঠিকমত কাজ করার জন্য শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের স্থান যথেষ্ট পরিমাণ প্রশস্ত ও নির্মল হওয়া প্রয়োজন।

(খ) বায়ু দূষন ও শ্বসন জটিলতা : বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের ঘনীভবন ও কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ স্বাভাবিক বা সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেড়ে গেলে এ অবস্থাকে বায়ু দূষন বলে। সাধারণত জ্বালানী পোড়ানো ধূয়া, কীটনাশক ব্যবহার, ধূলা, বৃষ্টি, কুয়াশা, ধোয়াশা, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি থেকে বায়ু দূষিত হয়।

বায়ু দূষনের ফলে ফুসফুসে বিষাক্ত বর্জ্য জমে যায় এবং এড্রিনাল গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সর্দি-কাশি নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, অ্যাজমা প্যুরোসি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি শ্বসন জটিলতা সৃষ্টি হয়। ফুসফুসের ও এড্রিনাল গ্রন্থির বিন্দুতে নিয়মিত আকুপ্রেসার চিকিৎসা করলে এবং প্রতিদিন সকাল বেলা নির্মল বাতাসে দশ মিনিট ফুসফুসের ব্যায়াম করলে শ্বসন জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

যারা খুব ঘন বসতি শহরে বা শিল্প এলাকার বাস করেন, বিভিন্ন কল কারখানায় (রসায়নিক; রাবার; তামাক) ইত্যাদিতে অথবা যারা খনিতে কাজ করেন। সেখানকার বাতাস দূষিত। তাদের প্রতিদিন উপরোক্ত চিকিৎসা করলে বিভিন্ন রকম শ্বসন জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

(গ) ফুসফুসের পরিচর্যা : ফুসফুস শরীরের একটি গুরুত্ব পূর্ণ অঙ্গ। এখান থেকেই অক্সিজেন মস্তিষ্ক ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে। মস্তিষ্ক যদি তিন মিনিটের বেশি সময় অক্সিজেন না পায় তাহলে মস্তিষ্কের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ফুসফুস যত বেশি বিকশিত হবে, তত বেশি অক্সিজেন গ্রহণ করবে এবং প্রাণ শক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে।

ফুসফুস পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম, দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, হাসা ও কান্না ইত্যাদি ক্রিয়ার অনুশীলন করা প্রয়োজন। এই সব ক্রিয়ার মাধ্যমে ফুসফুস পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয়। শিশুদের ৫-৬ বছর বয়স থেকেই এই সব ক্রিয়ায় অভ্যস্ত করে তুলতে পারলে তারা সুস্থ দেহ ও সুস্থ

মন নিয়ে গড়ে উঠবে ইনশআল্লাহ্ ।

অনেক সময় নাকের ছিদ্রের দেয়ালে এবং গলায় কফ জমে যায়, ফলে বাতাস ভিতরে এবং বাইরে আসা যাওয়া করতে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং শ্বাস-নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয় । হজম ক্রিয়া বন্ধিত হওয়ার কারণেও এ রকম হতে পারে ।

নিম্নলিখিত ফুসফুসের ব্যায়াম গুলোর যে কোন একটি নিয়মিত অনুশীলন করলে দেহে উপযুক্ত অক্সিজেন সরবরাহ করে ও রক্ত শোধন করে ।

ফুসফুসের ব্যায়াম-১ : চিৎ হয়ে শুয়ে শ্বাস নিন এভাবে শুনে ১, ২, ৩, ৪... । যতক্ষণ শ্বাস নিয়েছেন ততক্ষণ আটকিয়ে রাখুন । তারপর একই সময় ধরে শ্বাস ছাড়ুন । তারপর আবার শ্বাস বন্ধ করে রাখুন একই সময় । অন্তত দিনে ১০ থেকে ১৫ বার এই প্রক্রিয়া অভ্যাস করুন । আস্তে আস্তে প্রতিধাপে সময় বাড়ান । অর্থাৎ ১০ পর্যন্ত গোনার চেষ্টা করুন । প্রতিবার শ্বাস বন্ধের সময় ফুসফুস বিশ্রাম পায় এবং পুনরায় শক্তি লাভ করে । যক্ষ্মা রোগীদের উপর এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে অবিশ্বাস্য ফল পাওয়া যায় ।

ফুসফুসের ব্যায়াম-২ : শান্ত পরিবেশে সোজা হয়ে বসুন । খুব ঘন ঘন শ্বাস-নিঃশ্বাস নিতে থাকুন । প্রতি মিনিটে ১০বার থেকে শুরু করে প্রতি মিনিটে ৫০ বার পর্যন্ত করার চেষ্টা করুন । প্রতি বারে দুমিনিট করে প্রতি দিন দুই বার এই অভ্যাস করুন ।

ফুসফুসের ব্যায়াম-৩ : মুখ খুলে খুব ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করুন এবং মুখ বন্ধ করে সংগে সংগে নাক দিয়ে খুব জোরে শ্বাস ছেড়ে দিন । এক সাথে ১০ থেকে ১৫ বার এরূপ করুন । এই প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের জটিলতা দূর হয় ।

ফুসফুসের ব্যায়াম-৪ : প্রথমে এক নাক বন্ধ করে অন্য নাক দিয়ে শ্বাস নিন যতক্ষণ শ্বাস নিয়েছেন ততক্ষণ শ্বাস আটকিয়ে রাখুন তারপর ততসময় ধরে শ্বাস ছাড়ুন । এবার এই নাক বন্ধ করে অন্য নাক দিয়ে একই ভাবে শ্বাস-নিঃশ্বাস গ্রহণ করুন ।

শ্বাস গ্রহণের সময় বুকের ছাতি দুই থেকে তিন ইঞ্চি প্রসারিত করার চেষ্টা করুন । শ্বাস আটকানোর সময় পেটকে ভিতরের দিকে টেনে রাখতে চেষ্টা করুন । এতে ভূড়ি কমবে এবং বিশেষ ফল পাওয়া যাবে । শ্বাস

প্রশ্বাসে এই প্রক্রিয়াগুলো সকল বয়সের মানুষের জন্য উপকারী। নিয়মিত ভাবে এই অভ্যাসগুলো করলে :

১. শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ হবে ফলে রক্ত বিষ মুক্ত হবে সেই সাথে দেহও বিষ ও কার্বন মুক্ত হবে।
২. ঠাণ্ডা, কাশি, হাপানি, যক্ষা, পোলিও, মেনিনজাইটিস, মানসিক বিকার, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং পেশী সংক্রান্ত গোলযোগের ক্ষেত্রে এই অনুশীলনগুলো অতীব প্রয়োজন।

৩. কিডনির উপর অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় চাপ কমে যাবে।

৪. এর ফলে হৃজম শক্তিও বৃদ্ধি পাবে।

যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় যেমন দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে এমন কি হাটতে হাটতে এই অনুশীলন গুলো করা যায়। তবে খালি পেটে কিংবা আহারের দু'ঘণ্টা পরে করা ভালো এবং সকালবেলা নির্মল হাওয়ায় এই অনুশীলনগুলো করা সবচেয়ে বেশি উপকারী।

৪.২ হজম প্রণালী

শরীর সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ রক্ত। বিশুদ্ধ রক্ত আসে শরীরের উপযোগী খাদ্য ও পানীয় থেকে। অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয় ঠিকমত হজম হলে বিশুদ্ধ রক্ত তৈরি হবে। অতএব হজম ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। হজম ক্রিয়া শুরু হয় মুখ হতে পূর্বে উল্লোখ করা হয়েছে খাদ্য গ্রহণের সময় প্রত্যেক খাদ্য এমন কি নরম কিংবা মিষ্টি জাতীয় খাদ্যও ১০ থেকে ১২বার চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করা দরকার। খাদ্য চিবিয়ে না খেলে পাকস্থলীর উপর দ্বিগুন চাপ পড়ে এবং এক সময় পাকস্থলী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন প্রকার রোগ, স্থূলতা এমনকি ডায়বেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঠিকমত চিবিয়ে খেলে খাদ্যের পরিভৃষ্টি পাওয়া যায় এবং খাদ্যের সাথে যথেষ্ট লালা মিশ্রিত হয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য হজমে সহায়তা করে ফলে ডায়বেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, কম খাদ্যেই শরীরের প্রয়োজন মিটে যায় এবং ধীরে ধীরে খাদ্যের চাহিদা কমে যাবে। খাদ্য ঠিকমত চিবিয়ে খেলে কখন আমাদের পেট ভরে গেছে তা আমরা বুঝতে পারি। খাদ্য চিবিয়ে খাওয়া আমাদের নবী (স.) এর সুন্নত।

মুখেই আমরা ডায়বেটিস এর মত মারাত্মক রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

(ক) **পাকস্থলী একটি চুলা** : রান্নার চুলাতে যেমন পরিমাণ মত ভালো মানের জ্বালানী এবং যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস পেলে আগুন সর্বোচ্চ তাপ দেয় এবং ধুয়া ও ছাই কম হয়, তেমনি ভাবে পাকস্থলী নামক চুলার জন্য শরীরের উপযোগী পরিমাণ মত খাদ্য এবং পরিমাণ মত পানি পেলে যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ রক্ত ও শক্তি উৎপন্ন হয়। চুলাতে অতিরিক্ত জ্বালানী ব্যবহার করলে যেমন- প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন হয় না বরং ধুয়া ও কয়লা হয়। একই ভাবে উদর পূর্ণ করে খেলে খাদ্য ঠিকমত হজম হয় না। ফলে পাকস্থলীর দুর্বলতা সহ বিভিন্ন প্রকার পেটের পীড়া জন্ম হয়, রক্তে বিষাক্ত খাদ্য রস শোষিত হয়। এই সকল বিষাক্ত রস শরীরের বিভিন্ন অস্থি-সন্ধিতে জমা হয় এবং অস্থি-সন্ধিতে ব্যথা হয়। এজন্য খাদ্য গ্রহণের সময় উদর পূর্ণ করে খাওয়া উচিত নয়। পেটের তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য, একভাগ পানি এবং একভাগ খালি রাখা আমাদের নবী (স.) এর সুন্নত।

চুলার উত্তাপ যথেষ্ট না হলে যেমন কোন খাদ্য সিদ্ধ হয় না, তেমনি ভাবে পাকস্থলী নামক চুলার উত্তাপ যথেষ্ট না হলে খাদ্য ঠিকমত হজম হয় না। কোন কোন খাদ্যে পাকস্থলীর উত্তাপ রক্ষা করে এবং প্রয়োজনে বাড়ায়। আবার কোন কোন খাদ্য পাকস্থলীর উত্তাপ কমায়। যেমন- আদা, গোল মরিচ, যোয়ান এবং যে কোন তিতা ও কষা খাদ্য পাকস্থলীর উত্তাপ রক্ষা করে এবং প্রয়োজনে বাড়ায়। আবার ঠাণ্ডা পানীয়, আইসক্রীম ইত্যাদি খাদ্য পাকস্থলীর উত্তাপ কমায়, ফলে হজম ক্ষমতা হ্রাস পায়। আমেরিকার পুষ্টি বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন ঘুম থেকে ওঠার এক ঘণ্টা পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ দেহের অভ্যন্তরীণ উত্তাপ বৃদ্ধি করে। খাদ্য সহজে হজম হয় এবং বেশি শক্তি লাভ হয়। রাত্রে দেহীতে এবং গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করা হজম শক্তি মন্থর করে, শরীরে বেশি মেদ সৃষ্টি করে এবং পেটের গোলযোগ সৃষ্টি করে।

(খ) **পেট ভর্তি হওয়ার ট্রাফিক সিগনাল** : রাস্তায় ট্রাফিক সিগনালে যেমন সবুজ-হলুদ-লাল বাতি জ্বলে উঠে, ঠিক তেমনি খাদ্য গ্রহণের সময় পেট ভর্তি হওয়ার সংকেত হিসাবে তিনটি ঢেকুর আসে। আপনি অন্তত মধ্যবর্তী ঢেকুর অর্থাৎ হলুদ সিগনালের সময় খাবার গ্রহণ বন্ধ করুন।

রসনা তৃপ্তির জন্য যে কোন খাবারই আপনি খেতে পারেন। কিন্তু হলুদ সিগনালের সময় অবশ্যই আপনি খাদ্য গ্রহণ ত্যাগ করুন। তা না হলে বিপদ হতে পারে।

(গ) শরীরের উপযোগী খাদ্যের পরীক্ষা : খাদ্য গ্রহণের পর আপনি যদি নিজেকে আগের চেয়ে বেশি তৎপর, বেশি শক্তিশালী কিংবা বেশি কর্মক্ষম মনে করেন, তাহলে ঐ খাদ্য আপনার শরীরের জন্য উপযোগী। কিন্তু খাদ্য গ্রহণের পর যদি আপনি নিজেকে ভারী বোধ করেন, অলসতা আসে কিংবা ঘুম পায় তাহলে বুঝতে হবে।

১। এই খাদ্য আপনার শরীরের উপযোগী নয়।

২। অথবা আপনি বেশি খেয়ে ফেলেছেন।

৩। অথবা তাড়াতাড়ি খেয়েছেন।

৪। অথবা আপনার হজম শক্তি/পাকস্থলীর উত্তাপ কমে গেছে।

(ঘ) পাকস্থলীর উত্তাপ কমে গেলে কি হয় : আমাদের শরীরে যে সমস্ত উপাদান আছে তার মধ্যে শতকরা ৭২ ভাগই পানি। সেই পানি নিয়ন্ত্রিত হয় শরীরের তাপ দ্বারা। শরীরের তাপশক্তি নির্ভর করে হজম ক্রিয়ার উপর। হজম ক্রিয়া নির্ভর করে পাকস্থলীর উত্তাপের উপর। অতএব, হজম ক্রিয়া দুর্বল হলে শরীরে অতিরিক্ত পানি শুকাতে পারে না, ফলে শরীরের বিভিন্ন যায়গায় পানি জমে যায়।

১। যদি এই পানি মাথায় জমে যায় তাহলে মাথা ব্যথা, সাইনাস ইত্যাদি রোগ হয়।

২। এই পানি যদি গলায় জমে যায় তার গলার মধ্যে জমাট-ভাব থাকে এবং প্রতিবার কাশলেই শ্লেষা বের হয়। যার ফলে টনসিল, স্বরভঙ্গ ও গলায় ব্যথা ইত্যাদি হয়।

৩। এই পানি যদি ফুসফুস ও বুকে জমে যায়, তবে ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি, কাশি, ফ্লু, জ্বর, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগ হয়। এই সব রোগকে অবহেলা করলে নিউমোনিয়া হতে পারে।

হজম শক্তি দুর্বল অবস্থায় ঠাণ্ডা পানীয়, ভারী খাবার, দই, ঘোল এবং লেবু ও অন্যান্য টক জাতীয় জিনিস খেলে এই সব রোগের প্রকোপ আরও বেড়ে যায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ এবং হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন এদের শরীরে সহ্য হয় না।

(ঙ) পাকস্থলীর উত্তাপ বেড়ে গেলে কি হয় : অত্যধিক পিত্ত প্রবাহের ফলে শরীরের উত্তাপ বেড়ে যায় এবং পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণও বেড়ে যায়। ফলে পাকস্থলীর বাতাস গরম হয় এবং এই গরম বাতাস মাথা ও মুখের ফাকা যায়গা দখল করে। দিনের বেলার গরম বাতাস যেমন রাত্রে শীতল হয়ে শিশির জমাতে শুরু করে তেমনি মাথা ও মুখের এই গরম বাতাস ঠাণ্ডা ঘরে, বৈদ্যুতিক পাখার নিচে কিংবা রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় পানিতে পরিনত হয়। এই বাষ্পের সংস্পর্শে এসে মাথার স্নায়ুগুণী সংকুচিত হয় ফলে মাথা ব্যথা ও সাইনাস হয় এবং গলায় ঘাঁ হয়। মাথায় জমা এই ঠাণ্ডা পানি মস্তিষ্কের তরল পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে শ্লেষার পরিনত হয়। এই শ্লেষা যখন নীচে নামতে থাকে, তখন গলা ও নাকে অস্বস্তি বোধ হয়; ঘন ঘন হাঁচি আসে এবং নাক দিয়ে পানি (শ্লেষ্মা) পড়ে। এর ফলে টনসিল হতে পারে।

(চ) সুস্থতার জন্য চাই সুঘন স্বাদের খাদ্য : আমরা যে সকল খাদ্য পানীয় গ্রহণ করি তার স্বাদ মূলত ছয় প্রকার :

১) মিষ্টি, ২) নোনতা, ৩) টক, ৪) ঝাল, ৫) কষা, ৬) তিতা।

শেষের স্বাদের দুটি খাদ্য সাধারণত আমরা এড়িয়ে চলি। কিন্তু রক্ত শোধন এবং দেহে পুষ্টির সমতা রক্ষা করতে এই দুটি স্বাদের খাদ্য অপরিহার্য তাছাড়া এই দুটি স্বাদের খাদ্য পাকস্থলীর উত্তাপ রক্ষা করে, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মিষ্টি জাতীয় খাদ্যের কুফলকে অকার্যকর করে। একজন ইংরেজ ডাক্তার মন্তব্য করেছেন, ভারত বর্ষের যে সকল লোক নিম্ন পাতা খান তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি।

পাকস্থলীর উত্তাপকে ঠিক রাখার জন্য ৪০ বছর বয়সের পর থেকে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কোন এক ব্যক্তির জন্য একধরনের খাবার উপকারী হলেও অন্য ব্যক্তির জন্য তা উপকারী নয়। যেমন যাদের শরীরে আগুনের উপাদান (উত্তাপ) বেশি তাদের জন্য দই, ঘোল উপকারী কিন্তু যাদের শরীরে পানির উপাদান বেশি তাদের জন্য দই, ঘোল ক্ষতিকর। আবার এক ঋতুতে যে সকল খাদ্য ও শাক-সবজি উপকারী, অন্য ঋতুতে যে সকল খাদ্য ও শাক-সবজি উপকারী নয়। যেমন

যাদের শরীরে আগুনের উপাদান (উত্তাপ) বেশি তাদের জন্য দই, ঘোল উপকারী কিন্তু যাদের শরীরে পানির উপাদান বেশি তাদের জন্য দই, ঘোল ক্ষতিকর। আবার এক ঋতুতে যেসব খাদ্য ও শাক-সবজি উপকারী, অন্য ঋতুতে যেসকল খাদ্য ও শাক-সবজি উপকারী নয়।

হাথা থাকবে ঠাণ্ডা, পেট থাকবে নরম এবং পায়ে পাত্তা হবে গরম এগুলোই হলো সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

(ছ) হজম শক্তি বৃদ্ধির জন্য করণীয় :

- ১। খুব গরম ও একেবারে ঠাণ্ডা খাবার বর্জন করুন, খাবার হালকা গরম হওয়া উচিত।
- ২। ভাজা-পোড়া খাবার খাওয়া কমিয়ে দিন।
- ৩। প্রতিরাতে টুক দই খাবেন।
- ৪। প্রচুর পরিমাণ কাঁচা ও রান্না করা শাক-সবজি এবং বিভিন্ন ঋতুর দেশী ফল খাবেন।
- ৫। দুই আহারের মধ্যে কমপক্ষে ৫ ঘণ্টা ব্যবধান হওয়া উচিত। এই সময় যথাসম্ভব হালকা নাস্তাও বর্জন করা উচিত।
- ৬। পাকস্থলী একটি যন্ত্র, এরও বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই প্রতি রাতে ৮-৯ ঘণ্টা পাকস্থলী বিশ্রামে দেয়া উচিত। সপ্তাহে একদিন রাতে খাওয়া বন্ধ রাখুন।
- ৭। ৪০ বছরের পর থেকে রাতে ভারী খাবার বর্জন করুন। এ সময় রাতে শাক-সবজির রস পান করা উত্তম।
- ৮। মাসে তিন দিন রোজা রাখার অভ্যাস করুন।
- ৯। হজম শক্তি ও পাকস্থলীর উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য অংকুরিত বুট/মুগ খেতে পারেন এবং এর সাথে তিল, চিনাবাদাম, বাঁধাকপি, খেজুর, কিসমিস অথবা সামান্য তাল মিসরী খেতে পারেন। এর মধ্যে আছে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন সি,ই, ও বি কমপ্লেক্স, প্রোটিন এবং খনিজ লবণ। এটি শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মা ও বৃদ্ধ লোকদের জন্য খুবই উপকারী।

যাদের শরীরের ওজন খুব বেশি তাদের জন্য খেজুর, কিসমিস এবং তাল মিসরী যতটা সম্ভব না খাওয়াই ভালো। এছাড়া বাকি খাবারগুলো ওজন কমাবার পক্ষে ভালো কাজ করবে।

(জ) হজম শক্তি বৃদ্ধি ও ভালো স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন সোজা হয়ে বসা : যাদের হজমের সমস্যা আছে এবং যারা পিঠ, কোমর কিংবা পায়ের ব্যথায় ভোগেন তাদের অধিকাংশই সোজা হয়ে বসেন না বিশেষ করে যখন মেঝেতে বসেন। ঝুঁকে বসার ফলে :

১। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় পাকস্থলী ও তলপেট ঠিকমতো প্রসারিত হয় না। ফুসফুসের উপর অনেক চাপ পড়ে।

২। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায়।

৩। মেরুদণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ঝ) হজম শক্তি বৃদ্ধির ব্যায়াম : প্রথমত সোজা হয়ে বসার অভ্যাস করুন। দ্বিতীয়ত খাবারের আগে বা দু'ঘণ্টা পর চেয়ারে পিঠ রেখে সোজা হয়ে বসুন। প্রথমে লম্বা করে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেন তারপর লম্বা করে নিঃশ্বাস নিন। প্রতিদিন ৮-১০মিনিট এই অভ্যাস করুন। এতে পাকস্থলী ও তলপেট প্রসারিত হবে ফলে গ্যাস ও বদহজম কমে যাবে এবং স্থূলতা রোধ হবে।

(ঞ) হজম শক্তি বৃদ্ধিতে আকুপ্রেসার : হ্যান্ড রোলার এবং ফুট রোলার (চিত্র-১১৭ ও ১১৮) এ বর্ণিত উপায়ে যতটা সম্ভব চাপ দিন। প্রতিদিন



চিত্র-১১৭

সকালে নাস্তার পর এবং রাতে খাবার গ্রহণের পর পাঁচ মিনিট রোলিং করলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। ৪০ বছর বয়সের পর এগুলো প্রত্যেকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।



চিত্র-১১৮

(ট) দেহের প্রকৃতি : আমাদের দেহ আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এ উপাদানগুলো যদি সঠিক মাত্রায় বজায় থাকে, তবে দেহে বিপাক ক্রিয়া যথাযথ হয় এবং দেহের সুস্থতা বজায় থাকে। কিন্তু বংশগতকারণে, খাদ্যাভ্যাস ও জীবন-যাপনের অভ্যাসের জন্য এ উপাদানগুলোর এক বা একাধিক উপাদানের আধিক্য দেখা যায়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতিতে দেহের উপাদান আধিক্যকে তিনটি প্রকৃতিতে ভাগ করা হয়েছে :

১. মাটি ও পানির আধিক্য (কফ প্রকৃতি)।

২. আগুন ও বাতাসের আধিক্য (পিত্ত প্রকৃতি)।

৩. বায়ুর আধিক্য (বায়ু প্রকৃতি)।

কফ প্রকৃতি : অত্যধিক ভোজন করলে, ক্ষিধে না পেলেও মাঝে মধ্যে আহার করলে এবং ঘন ঘন মিষ্টি ও ভাজা জিনিস খেলে হজমের সমস্যা হয় এবং দেহে যথেষ্ট তাপ সৃষ্টি হয় না। ফলে পানির মাত্রা বেড়ে যায় এবং তাপের মাত্রা কমে যায়। এই কারণে নিষ্ক্রিয়তা, ভারি ভাব এবং চর্বির আধিক্য দেখা দেয়।

এ ধরনের ব্যক্তিদের অবাঞ্ছিত খাদ্য, শীতল পানীয় এবং যেসব খাদ্যে সমস্যা বাড়ায় তা এড়িয়ে চলা উচিত। দিনে ঘুমানো এবং অধিক যৌন ক্রিয়া এড়িয়ে চলা উচিত। তাদের নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে এবং শুধু খিদে পেলেই খাদ্যগ্রহণ করতে হবে। দুধ তাদের জন্য ক্ষতিকর।

পিত্ত প্রকৃতি : এ প্রকৃতির ব্যক্তিদের অধিক তাপের ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যে ব্যঘাত ঘটে, অ্যাসিডিটি, আলসার, সর্দি গর্মি, ত্বকের সমস্যা, যৌন দুর্বলতা, খিঁটখিঁটে স্বভাব এবং চুল পড়া ইত্যাদি সমস্যায় ভোগে। উৎকর্ষা, দুশ্চিন্তা অত্যধিক ভাজা ও মশলা যুক্ত খাদ্য, বেশি রোদ লাগানো এবং অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার এদের সমস্যা বাড়ায়।

১। এদের অগ্ন্যাশয় ও এড্রিনাল গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২। হরিতকি চূর্ণ ৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত উপায়ে খেতে হবে।

৩। মিষ্টি ফলের রস ও সবুজ রস পান করতে হবে।

৪। খাওয়ার পরে ফল খেতে হবে।

৫। চা, কপি এদের জন্য ক্ষতি কর।

বায়ু প্রকৃতি : এ প্রকৃতির ব্যক্তির বেশি কথা বলেন, তারা দিবাস্বপ্ন দেখেন, বেশি ঘুমান এবং এদের গ্যাসের সমস্যা হয়। শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যের অভাবে মূর্ছা হয়। ভারী, তৈলাক্ত এবং ভাজা খাবার এদের সমস্যা বাড়ায় কিন্তু এগুলোর প্রতি তাদের প্রবণতা অনেক বেশি।

১। এ ধরনের ব্যক্তিদের কোষ্ঠ-কাঠিন্য এড়িয়ে চলা উচিত।

২। দেহের উত্তাপ এবং তাপ সম্বলন বাড়ানোর জন্য বেশি করে ব্যায়াম করা উচিত।

৩। এদের অবাস্তিত খাদ্য এড়িয়ে চলা উচিত।

দেহের প্রকৃতি জানার সহজ উপায় : স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এক গ্লাস পানি নিন, ধীরে ধীরে পান করুন, থামুন আবার ধীরে ধীরে পান করুন, থামুন আবার ধীরে ধীরে পান করুন, স্বাদের বিষয় পরীক্ষা করুন।

১। যদি তিতা লাগে তাহলে পিত্ত প্রকৃতি।

২। যদি মিষ্টি লাগে তাহলে কফ প্রকৃতি।

৩। যদি টক লাগে তাহলে বায়ু প্রকৃতি।

প্রত্যেকেই তার নিজস্ব প্রকৃতি খুঁজে বের করে তাদের সমস্যা সৃষ্টি করে এমন খাদ্য এড়িয়ে চলা উচিত।

প্রত্যেক ব্যক্তিই যেমন প্রকৃতির দিক থেকে অপর থেকে আলাদা, ঠিক তেমনি তাদের স্বাস্থ্যের প্রবণতা ও সমস্যাও আলাদা। এজন্য খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন করে সুস্থ থাকা সম্ভব।

(ঠ) **এলার্জি :** বংশগত কারণে, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের বদঅভ্যাসের জন্য দেহের উপাদানগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক উপাদানের আধিক্য দেখা যায়। ফলে কোনো বস্তুর প্রতি অত্যনুভূতি থাকে। রক্তের শ্বেত কণিকার কিছু কোষ ঐ বস্তুর সংস্পর্শে আসা মাত্রই বিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং কিছু রাসায়নিক পদার্থ রক্তে নিঃসৃত হয়। ঐ রাসায়নিক



(চিত্র-১১৯)

পদার্থ ঐ বস্তুর সাথে বিক্রিয়া করে শরীরে কিছু পরিবর্তন ঘটায়। যেমন : চর্মে চুলকানিযুক্ত ছোট ছোট লাল উদ্ভেদ, হাঁচি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি দেখা দেয়। শরীরের এ প্রতিক্রিয়াকে এলার্জি বলে। ১১৯নং চিত্রে, বর্ণিত বিন্দুতে নিয়মিত চিকিৎসা করে এলার্জি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

(ড) **শরীরের ভাষা** : শরীরের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে কিম্বা কোনো প্রতিকূল অবস্থায় শরীর আমাদেরকে বিভিন্ন সংকেত দেয়। সংকেতগুলো বুঝে শরীরকে রোগ মুক্ত হতে সাহায্য করা উচিত।

১. পেট ভর্তি হলে যখন টেকুর আসে। তখন খাবার বন্ধ করার চেষ্টা করুন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কমপক্ষে হলুদ সিগন্যালের সময় খাবার বন্ধ করুন।
২. কার্বন, পানি ও বায়ু ইত্যাদি শরীরের কোনো অঙ্গে অধিক পরিমাণ জমা হলে ঐ অংশে ব্যথা হয়।
৩. শরীরে ঠাণ্ডা লাগলে অথবা গলা ও বুকে জমাকৃত পানি বের করে দেয়ার চেষ্টা করলে কাশি হয়।
৪. নাক দিয়ে পানি পড়লে বা হাঁচি আসলে শরীরে অতিরিক্ত পানি জমে গেছে বা শরীরের উত্তাপ বেড়ে গেছে। শরীর তা বের করে দেয়ার চেষ্টা করছে।
৫. শরীরের কোথাও খোস পাচড়া ও চুলকানী হলে শরীরের ঐ অংশে আরও বেশি রক্ত সরবরাহ প্রয়োজন অথবা রক্তে বিষাক্ত উপাদান বেড়ে গেছে। কিডনি তা শরীর থেকে বের করে দিতে পারছে না।
৬. জ্বর হলে বুঝতে হবে রক্তের শ্বেতকণিকা কোনো জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করছে।
৭. বুক ধড়ফড় করলে বা বুকে ব্যথা হলে হৃৎপিণ্ডের সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন।
৮. ক্ষুধা না লাগলে দুর্ভাগ্য হবে দেখে পানি জমে গেছে অথবা কোষ্টকাঠিন্য হয়েছে অথবা পাকস্থলী ও হজম প্রণালীর অন্যান্য অঙ্গে আর্দ্রতা জমে গেছে। এ অবস্থায় পাকস্থলীর উপর বাড়তি চাপ দেয়া ঠিক নয়। শুধুমাত্র হালকা গরম পানি, ফলের রস বা দই খাওয়া উচিত।

ওষুধ ব্যবহার করে এই সংকেতগুলো সংগে সংগে চেপে দিলে এর ফলাফল খুব খারাপ হতে পারে। যেমন- সর্দি ওষুধ দ্বারা চাপা দিলে পরবর্তীতে এজমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার জ্বর যদি হঠাৎ করে চাপা দেয়া হয় তবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। এসবে সংকেতগুলোর সাথে সম্পর্কিত বিন্দুতে আকুপ্রেসার চিকিৎসা করে শরীরকে রোগ মুক্ত রাখা যায়।

(ঢ) **দেহের অতিরিক্ত তাপ বের করে দেয়ার উপায় :** যাদের শরীরে উত্তাপ খুব বেশি, তাদের হজম শক্তি দুর্বল। তারা বিভিন্ন প্রকার শরীরিক সমস্যায় ভুগেন। চিকিৎসার শুরুতে শরীরের বাড়তি উত্তাপ বের করে দিতে হবে। ১ চামচ হরিতকি চূর্ণ ১ কাপ পানিতে মিশিয়ে (প্রয়োজনে ১ চামচ চিনি দেয়া যেতে পারে) সকাল বেলা খালি পেটে ১০-১২ দিন পান করতে হবে। তারপর সপ্তাহে দু/এক দিন নিয়মিত পান করলে শরীরের বাড়তি উত্তাপ বের হয়ে যাবে। এতে পেট পরিষ্কার থাকবে এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য জনিত অনেক সমস্যারও সমাধান হবে। যাদের শরীরে পিত্তাধিক্যের সমস্যা আছে, তারা যদি উপরের নিয়মে পান করেন, তবে পিত্তাধিক্য কমে যাবে। এ ছাড়া যদি এ পাউডার খালি পেটে হালকা গরম পানির সাথে মিশিয়ে ৪৫ থেকে ৬০ দিন পান করেন, তাহলে দেহের মেদ অনেক কমে যাবে। এর মধ্যে দু/এক বার পাতলা পায়খানা হতে পারে। এরকম হলেও ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। খাওয়ার স্যালাইন ও হালকা খাবার খেলেই চলবে।

(ণ) **সবুজ রস :** সমপরিমাণ পালংশাক, লাউশাক, বাঁধাকপি, বাটির শাক, পুদিনা পাতা, তুলসী পাতা ইত্যাদির সাথে লাউ, মুলা, ধুন্দুল ইত্যাদি সবজি এক কথায় যে কোন নির্বিষ শাক-সবজি ভালো ভাবে পরিষ্কার করে ১০ মিনিট হালকা গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর এক গ্লাস পানি মিশিয়ে ব্লান্ডারে ব্লান্ড করে ছেকে নিন। যেসব শাকসবজি যত পুরু এবং যত বেশি সূর্যের আলো পায় তাতে তত বেশি প্রাণশক্তি থাকে। এগুলো হলো সবুজ নিয়মিত পান করলে ইনশাআল্লাহ আপনি হবেন চির সবুজ। দেহের প্রয়োজনীয় সব রকমের লবণ ও খনিজ পদার্থ এর মধ্যে আছে এবং এগুলো সহজেই হজম হয়।

সবুজ রসের উপকারিতা : সূর্যের সব রকমের শক্তি ফল ও সবজির মধ্যে আছে প্রতি দিন খাদ্য তালিকায় এক গ্রাস ফলের এবং এক গ্রাস শাক-সবজির রস রাখলে খাদ্যের চাহিদা হবে নূনতম কিন্তু শরীরে শক্তির বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না এবং শরীর ও সুস্থ-সবল থাকবে।

- ১। রক্তে ক্যালসিয়াম হলে বেশি ক্যালরি যুক্ত খাদ্য হজম করতে পারে না ফলে ওজন কমে যায়। এ রসে ক্যালরি খুব কম থাকে নিয়মিত পান করলে দ্রুত ওজন বাড়ে।
- ২। যাদের ওজন বেশি তারা নিয়মিত রাতে ৫-৬ কাপ এই রস পান করলে ভালো ফল পাবেন।
- ৩। এ রস পাকস্থলী ও অন্ত্রের সব বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় তাই প্রথম দিকে পাতলা পায়খানা হতে পারে এতে ভয়ের কোনো কারণ নাই।
- ৪। শিশু গর্ভবতী মা, অসুস্থ ব্যক্তি এবং বয়স্ক লোকদের জন্য এটি নিয়মিত পান করা উচিত।

(ত) স্বাস্থ্যকর পানীয়/স্বাস্থ্যকর চূর্ণ : তিন ভাগ আমলকি (৩০০ গ্রাম) ও এক ভাগ আদা (১০০ গ্রাম) ও ১ গ্রাস পানিসহ রাভারে রাভ করে ছেঁকে নিন। এটাই স্বাস্থ্যকর পানীয়। আবার এই একই অনুপাতে আমলকি ও আদা শুকিয়ে চূর্ণ করলে যে গুড়ো তৈরি হয় তাই স্বাস্থ্যকর চূর্ণ। এর স্বাদ অম্ল-মধুর, টক নয়। প্রয়োজনে এর সঙ্গে একটু লবণ মিশিয়ে পান করতে পারেন।

আমলকিতে লেবুর তুলনায় ১৬ গুণ বেশি ভিটামিন সি আছে। এই পানীয় পান করলে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচা যায় এবং হজম শক্তি বাড়ে। দীর্ঘ রোগ মুক্তির পর, বৃদ্ধ বয়সে, অন্তঃসত্ত্বাকালীন অবস্থায় এবং উঠতি বয়সের শিশুদের পক্ষে এটি খুবই উপকারী।

(থ) কালো চা তৈরির উপায় : এক চামচ চায়ের পাতা এক কাপ পানিতে ঢেলে ফুটিয়ে অর্ধেক কাপ করে নিন। এর পর ছেঁকে নিয়ে অর্ধেক কাপ সাধারণ পানি (ঠাণ্ডা নয়) মিশান। ১২ থেকে ১৫ দিন এটি গরম গরম পান করুন। কিডনির যে কোনো সমস্যার জন্য এ চা খুবই উপকারী।

পঞ্চম অধ্যায়

কতিপয় রোগের চিকিৎসা

গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ রোগই দেহের মধ্যে রাতারাতি প্রবেশ করে না। দেহের প্রকৃতির বিরুদ্ধে খাদ্যাভ্যাস, দেহের সংকেতগুলোকে অবজ্ঞা করা, অধিক পরিমাণ কোমল পানীয়, ধূমপান ইত্যাদির মতো ক্ষতিকর অভ্যাস এবং বর্তমানে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের ফলে দেহের যন্ত্রগুলোকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় ফলে বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি হয়। অসুস্থতার প্রথম দিকে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে।

- ১। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় ফলে শরীর হতে বিষাক্ত পদার্থ বের হতে পারে না।
- ২। পাকস্থলীর দহন শক্তি কমে যায়, খাদ্য ঠিকমতো হজম হয় না ফলে ক্ষুধা কমে যায়, পরিণামে কোষ্ঠ-কাঠিন্য কিংবা বিভিন্ন পেটের পীড়া দেখা দেয়।
- ৩। মূত্রগ্রন্থি, কিডনি এবং পাকস্থলী ঠিকভাবে কাজ করে না ফলে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত উৎপাদন হয় না এবং রক্ত দূষিত হয়ে যায়।
- ৪। দেহে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায় এবং কার্বন ও অন্যান্য জৈব বিষ শরীর থেকে বের হতে পারে না। এইসব বিষাক্ত পদার্থ বিভিন্ন অঙ্গে জমতে শুরু করে এবং সেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে অঙ্গগুলো ধীর গতিতে কাজ করে, জীবনীশক্তি কমে যায়, দেহ দুর্বল হয়ে যায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- ৫। কোন রোগ দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বপ্রথম থাইরয়েড ও প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থিতে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং এর সুইচে ব্যাধা হয়।

৬। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো পরস্পর সম্পর্ক থাকায় একটি গ্রন্থি খারাপ হলে অন্যগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য অনেক দিন ধরে রোগে ভুগলে একাধিক অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বিন্দুতে ব্যথা অনুভব হয়।

আকুপ্রেসার আমাদের দেহ হতে কার্বন ও বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। যখন কোনো অঙ্গের বিন্দুতে চাপ দেয়া হয় তখন ঐ অঙ্গে শক্তিশালী বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয়। এর ফলে ঐ অঙ্গের চারদিকে পঞ্জীভূত কার্বন ও বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায়, অঙ্গটি আবার সচল হয়, স্বাভাবিক ভাবে কাজ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে কোনো রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে তাকে দমন করে দেয়।

রোগের হাজারও নাম আছে কিন্তু প্রতিটি রোগই শরীরের কোনো না কোনো অঙ্গ বা গ্রন্থির সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং অঙ্গ ও গ্রন্থিগুলোর বিন্দুগুলো চিকিৎসা করে প্রতিটি রোগেরই চিকিৎসা করা সম্ভব।

ক্রঃ	রোগ	কি কারনে হয় / লক্ষন	চিকিৎসা
০১	মাথা ব্যথা	ঋতু বদলের সময় ঠাণ্ডা লাগলে।	১, ২, ৫ এবং ৭নং এবং ৩৪ নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন।
		যকৃত ক্ষতিগ্রস্ত এবং অগ্ন্যাশয়ের উপর অধিক চাপ থাকলে।	২৩, ২৫ এবং ২৬নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন।
		চোখের গোলমাল কিংবা ঘাড়ে টান পড়লে	৩৫ নং এবং ৭নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন।
০২	উচ্চ চাপ	রক্তে লবণের আধিক্য হলে, (অনেক সময় দুশ্চিন্তার কারনে) হৃৎপিণ্ডের তৃতীয় অংশ (3 rd ventricle) থেকে রক্ত মস্তিষ্কের তরলে তোলার জন্য যে বাড়তি চাপের প্রয়োজন হয় তার ফলেই উচ্চ রক্ত চাপ সৃষ্টি হয়।	১। খাদ্যে লবণ, মশলা কমিয়ে/ বাদ দিন। তার বদলে বীট লবণ ব্যবহার করতে পারেন। ২। পিনিয়াল ও অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির উপর চাপ দিন। ৩। বড় এক চামচ মধু ও এক চামচ স্বাস্থ্যকর চূর্ণ মিশিয়ে এক গ্লাস সরবত পান করুন। ৪। অন্তত এক গ্লাস ফলের রস পান করুন।
০৩	নিম্ন চাপ	যখন অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি অধিক কাজ করে তখন রক্তে শর্করার মাত্রা	১। অগ্ন্যাশয় সহ সব কয়টি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিতে চাপ দিন।

		কমে যায়, তখন মস্তিষ্কের তরলে শর্করার মাত্রাও কমে যায়। যার ফলে মস্তিষ্ক ও দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রক্ত চাপ কমে যায়।	২। প্রতি দিন বড় এক চামচ মধু ও এক চামচ স্বাস্থ্যকর চূর্ণ মিশিয়ে পান করুন। দুই কাপ সবুজ রস পান করুন। ৩। অন্তঃগুচ্ছ যথাযথ অবস্থায় না থাকলে তা ঠিক করে নিন।
০৪	তরুনসর্দি, কাশি, সাইনোসাইটিস ও হাপানি	সাধারণ সর্দি, টনসিল, সাইনোসাইটিস, হাপানি ইত্যাদি রোগের মূল কারণ হলো গরমের জন্য সর্দি হওয়া। এ অবস্থায় এড্রিনাল গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঔষধ দিয়ে চেপে দিলে সাময়িক উপসম হয় কিন্তু শরীর ঠিক হলে আবার বাড়তি পানি বের করে দিতে চায়। এরকম বারবার ঘটলে এলার্জি এমন কি হাপানিতে আক্রান্ত হয়।	১। বাড়তি তাপ বের করার জন্য হরিতকির গুড়ো নিয়ম মত সেবন করুন। ২। ২৮ নং বিন্দুতে চিকিৎসা চালিয়ে যান প্রয়োজন হলে ৩০ নং বিন্দুতেও চিকিৎসা করুন। ৩। প্রতি রাতে দু'টি লবঙ্গ, দু'টি গোল মরিচ ও পাঁচ গ্রাম পরিমাণ আদা ছেচে এক কাপ পানির সাথে মিশে ছেকে পান করুন।
০৫	টনসিল	ঠাণ্ডা লাগলে অথবা পাকস্থলীর তাপ কমে গেলে টনসিল হতে পারে।	দিনে দুই বার ৭নং, ৩০নং এবং ৩৪নং বিন্দুতে চাপ দিন। সামান্য হলুদের গুড়া


			<p>গরম পানিতে মিশিয়ে দিনে তিন বার গার-গেল করুন।</p> <p>কোষ্ঠকাঠিন্য যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ রাখুন। প্রতি রাত্রে সবুজ রস (তৈরির সময় দুইটি গোল মরিচ, দুইটি লবঙ্গ ও পাঁচ গ্রাম আদা মিশিয়ে নিন) পান করুন।</p>
০৬	বধিরতা	<p>গর্ভধারণের সময় যদি মায়ের সাইনাসের সমস্যা, সর্দি ও মাম্পস ইত্যাদি হয় তবে শিশুটি জন্মগত বধির হতে পারে।</p>	<p>কৃমি থাকলে বের করে দিন। ১ থেকে ৬নং, ৩০নং, ৩১নং এবং ৩৪নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন। কানে পুঁজ থাকলে ১৬নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন।</p>
০৭	হৃদরোগ/ বুকের ব্যথা	<p>সকল বুকের ব্যথাই হৃদরোগ নয়। ঠাণ্ডা লাগার জন্য মেরুদন্ডের বক্ষদেশীয় ৬ ও ৮ নং অস্থি সন্ধির সাইটিকা স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে হৃদপিণ্ডে চার দিকের পেশীতে যন্ত্রনা সঞ্চালিত হয়। এক্ষে-</p>	<p>১। মেরুদন্ডের ৯নং বিন্দুতে নিয়মিত চিকিৎসা করলে বুকের ব্যথা উপসম হয়।</p> <p>২। যদি ৩৬নং বিন্দুতে ব্যথা থাকে তাহলে সংগে সংগে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিন। ৩৬নং বিন্দুতে এবং</p>

		<p>রেতে এই সমস্যা ধরা পড়ে না। অনেক সময় একে রুখপিন্ডের সমস্যা মনে করে ভুল করা হয়।</p> <p>৩৬নং বিন্দুতে চাপ দিলে ব্যথা হলে বুঝতে হবে হৃদরোগের কারণেই ব্যথা।</p>	<p>২নং ও ৫নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন।</p>
০৮	হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া	<p>প্রচণ্ড মানসিক চাপ, ভয় অথবা আঘাতের কারণে এইরূপ হতে পারে।</p>	<p>২১ ও ২২ নং চিত্রের অনুরূপ ৪/৫ মিনিট ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করলে জ্ঞান ফিরে আসবে।</p>
০৯	বাত/সন্ধি বাত/বাত জ্বর/ পক্ষাঘাত	<p>দেহের উত্তাপ বেড়ে গেলে। হজম ক্রিয়া গোলমাল হলে থাইরয়েড/প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিংবা যৌন গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে। আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘনঘন সর্দি হলে দেহের উত্তাপ কমে যায় ফলে বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা হয়। অনেক সময় জয়েন্টগুলো ফুলে যায়।</p>	<p>সবগুলো গ্রন্থিসহ অন্যান্য ব্যথার বিন্দুগুলোতে দিনে দুবার চাপ প্রয়োগ করুন। দিনে দুবার হ্যান্ড রোলার ও ফুট রোলার গড়ান। একটি লাইলনের কাপড় কাচা ব্রাশ দিয়ে পায়ের তালুতে ৫ মিনিট ঘষুন, যাতে পায়ের তালু মাথার তালুর চেয়ে বেশি গরম হয়।</p>

১০	রক্তস্বল্পতা এবং থ্যালা সেমিয়া	মহিলাদের মধ্যে এই রোগের প্রবনতা খুব বেশি। এই ক্ষেত্রে রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্র ক্রিয়া দুর্বল থাকে। গ্রন্থিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত থাকে।	১। সমস্ত গ্রন্থিগুলো এবং পরিপাক প্রণালীর অঙ্গ সমূহে দিনে দুই বার চাপ প্রয়োগ করুন। ২। ৩৭নং বিন্দুতে দিনে তিনবার চাপ প্রয়োগ করুন। ৩। ৩টি কালো কিচমিচ রাত্রে এক গ্রাস পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালবেলা খালি পেটে ঐ পানি পান করুন এবং কিচমিচ গুলো চিবিয়ে খান। ৪। ২ গ্রাস পানি ৫০ গ্রাম পরিমাণ লোহার টুকরা সহ জাল দিয়ে — গ্রাস করুন। সকাল বেলা ঐ পানি ছেকে পান করুন। ৫। কাচা সবজির রস পান করুন।
১১	জন্ডিস	মাথাভারী লাগে, পেট জ্বালা করে, বমির ভাব হয়।	১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৫ ও ২৮ নং বিন্দুতে চাপ দিন। ভারী ও তৈলাক্ত খাবার বর্জন করুন।

১২	গ্যাস এবং গ্যাস্ট্রিক	পাকস্থলী সমস্যা বদ হজম, পিত্তাধিক্য ইত্যাদি।	সর্ব প্রথম নাভিচক্র পরীক্ষা করে নিন। ঠিক না থাকলে ঠিক করে নিন। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকলে খুতনীর মাঝখানে বুড়ো আঙ্গুলী দিয়ে ২ থেকে ৬ মিনিট ঘষুন। দেহকে কৃমিমুক্ত করুন। ১৯, ২২, ২৩ এবং ২৭ নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন। প্রত্যেক বেলা খাদ্য গ্রহণের পর দু'টি লবঙ্গ ছিবিয়ে খান। প্রতি রাত্রে দু'টি লবঙ্গ, দু'টি গোল মরিচ ও পাঁচ গ্রাম পরিমান আদা ছেচে এক কাপ পানির সাথে মিশে ছেকে পান করুন।
১৩	দাউদ		গোসলের পর আক্রান্ত স্থানটি শুকনা করে মুছে ডেটল দিয়ে ঘষে নিন। তারপর সেখানে ৩ থেকে ৫ মিনিট ধরে বোরিক পাউডার ঘষুন। চমৎকার ফল হবে।

১৪	পেটের অসুখ, পাতলা, পায়খানা ও ডিসেনট্রি	অতিরিক্ত ভোজন ও বদ হজমের কারনে হয়।	১৯, ২০, ২৩, ২৫ ও ২৭ নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য খুতনীর মাঝখানে ২ থেকে ৫ মিনিট ঘষুন। নাভি চক্র পরীক্ষা করে নিন, ঠিক না থাকলে ঠিক করে নিন।
১৫	ঠাণ্ডা লাগা	আবহাওয়া বদল, বদহজম, অতিরিক্ত খাওয়া কিংবা কাচা চিনি খেলে।	দিনে দুই বার ৭ নং, ৩০ নং এবং ৩৪ নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন। প্রতি রাতে দু'টি লবঙ্গ, দু'টি গোল মরিচ ও দশ গ্রাম পরিমান আদা ছেচে এক কাপ পানির সাথে মিশে ছেকে পান করুন।
১৬	কিডনি	পা ফুলে যাওয়া, হাটু, কোমরে ব্যথা এবং প্রসাবে গন্ধ হওয়া। সকাল বেলায় প্রথম প্রসাব একটি পরিষ্কার পাত্রে রাখুন। কিডনির সমস্যা থাকলে ইহা দুর্গন্ধযুক্ত ও ঘোলাটে	১৮, ২৬ নং বিন্দুতে চাপ দিন। সকালে ১ কাপ কালো চা পান করুন। ১০ থেকে ১২ দিন কালো চা পান করুন। যদি প্রসাব পরিষ্কার ও দূর্গন্ধহীন হয় তাহলে বুঝতে হবে

		হবে।	কিডনি স্বাভাবিক ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। না হলে আবার ১০ থেকে ১২ দিন পান করুন।
১৭	প্রসাবে গন্ডগোল	স্বল্প প্রসাব, ঘন ঘন প্রসাব, মূত্রথলিতে ইনফ্যাকশান অথবা মূত্রথলিতে পাথর।	১১ থেকে ১৫ নং ১৮ নং এবং ২৬ নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন,
১৮	বিছানায় প্রসাব।		১২০ নং চিত্রের অনুরূপ উভয় হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের উল্টা পিঠের প্রথম দুই কর-এ ২ মিনিট চাপ প্রয়োগ করুন।
১৯	চর্মরোগ	ভিটামিন 'সি' এর অভাব হলে রক্ত দূষিত হয়ে যায়। রক্তের বিষাক্ত পদার্থ যদি কিডনির মাধ্যমে বেরিয়ে না যায়, তখন এই অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ ঘামের সাথে বের হয়ে যায় ফলে চর্মরোগ হয়।	৮, ১৮, ২৬ এবং ৩০ নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন আমলকী বা লেবু মিশিয়ে কাঁচা সবুজ রস পান করুন। বাদাম ও তিল খেলে চর্মরোগ দ্রুত সেরে যায় এবং শুষ্ক চামড়া স্বাভাবিক হয়।
২০	হাটুর ব্যথা		৮নং, ২৬ নং এবং সাইটিকা নার্ভের পয়েন্টে চাপ দিন।

			ব্যথা অসহ্য হলে সমপরিমান (হলুদের গুড়ো + জোয়ান + রসুন) বেটে হাটুতে লাগিয়ে দিন, ৭-৮ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন
২১	কোমরের ব্যথা	মেরুদণ্ড, কিডনি ও কোষ্ঠ-কাঠিন্যের সমস্যার জন্য এইরূপ হয়।	৯নং, ২৬নং এবং সাইটিকা নার্ভের পয়েন্টে চাপ দিন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মেরুদণ্ডের ব্যয়াম করুন। হ্যান্ড-রোলার ও ফুট-রোলার পাঁচ মিনিট করে প্রতিদিন সকাল-বিকাল রোলিং করুন। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকলে কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করার চিকিৎসা করুন।
২২	হাত পা ফুলে যাওয়া	সাধারণত কিডনির সমস্যা হলেই হাত পা ফুলে যায়।	২৬ নং বিন্দুতে চাপ দিন যদি ব্যথা না থাকে তবে এটি গুরুতর সমস্যা নয় ৩৬ নং বিন্দু পরীক্ষা করে নিবেন। ব্যথা থাকলে চাপ দিয়ে বের করে দিন।

২৩	পাঁজরের ব্যথা	সাইটিকা স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে পাঁজরের ব্যথা হতে পারে।	৯নং বিন্দুতে চাপ দিন এবং সাইটিকা নার্ভে দুই মিনিট করে চাপ দিন।
২৪	নিতম্বের ব্যথা	সাইটিকা নার্ভের সমস্যার কারণে নিতম্ব, উরু এবং পায়ে ব্যথা হয়।	সাইটিকা নার্ভে ক্রমাগত দুই মিনিট করে চাপ দিন।
২৫	হার্নিয়া		দিনে তিনবার ১১ থেকে ১৫নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন। গোসলের পর দু'হাতে তোয়ালের দুকোন ধরে দুই পায়ের মাঝে রাখুন। তারপর সেটিকে ২ মিনিট ধরে ডান ও বাম উরুর নীচে ঘষুন।
২৬	অশ্ব	একাধারে কোষ্ঠবদ্ধতার ফলে অশ্ব হয় অনেক সময় মলদ্বারে অসহ্য যন্ত্রনা হয় এবং রক্ত পড়ে।	১। প্রথমে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করার জন্য কোষ্ঠ কাঠিন্যের চিকিৎসা করুন। ২। হাতের তালু ও পায়ের তালুর ১০ ও ২০ নং বিন্দুতে দিনে তিন বার চাপ দিন। ৩। এক চামুচ হরিতকীর গুড়া এক কাপ পানিতে

			মিশিয়ে প্রতিদিন সকালবেলা খালি পেটে পান করুন। ৪। অধিক মসলা ও ঝাল যুক্ত খাদ্য বর্জন করুন। ৫। ক্রিমি থাকলে বের করে দিন।
২৭	ফোড়া	লসিকা গ্রন্থি ঠিকমত কাজ না করলে এবং কিডনির বিষাক্ত পদার্থ শরীর থেকে বের করে দিতে না পারলে ফোড়া হয়।	১৬নং ও ২৬নং বিন্দুতে চাপ দিলে ফোড়া ভাল হয় এবং নতুন ফোড়া উঠা বন্ধ হয়ে যায়।
২৮	বহু মুত্র		১৬, ২৫ ও ২৮ নং বিন্দুতে নিয়মিত দুই বেলা চিকিৎসা করলে বহুমুত্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। টাটকা ধনে পাতার আধা কাপ রস ৩৫/৪০ দিন ধরে পান করুন অথবা ৮/১০টি আমপাতা আধা ঘন্টা পানিতে ভিজ়ে রাখুন, তারপর ঐ পাতাগুলি বেটে তার রস হেঁকে ৩৫/৪০ দিন পান করুন। অতিরিক্ত

			টেনশান দূর করুন। এভাবে এই ভয়াবহ রোগ ইনশাআল্লাহ সহজেই নিয়ন্ত্রন করা যাবে।
২৯	মানসিক চাপ	বর্তমানে বিলাসী জীবনযাত্রা ও মানসিক সুখের অভাবে মানসিক চাপ বাড়ছে। ফলে দেহ ও মন ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে। যারা মানসিক ভাবে দুর্বল তারা অসুস্থতা, ভয় ইত্যাদি সামান্যতেই মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন।	উভয় হাত ও পায়ের মধ্যমা আঙ্গুলের গোড়ায় (গন্ধ বিন্দুতে) চাপ দিন যদি ব্যথা অনুভূতি হয় তবে মানসিক চাপ আছে। যদি ব্যথা অসহ্য হয় তবে ঐ ব্যক্তি ভেঙে পড়তে চলছেন। ১। হাত পায়ের মধ্যমা আঙ্গুলের গোড়ায় দুই মিনিট চাপ দিন। প্রচন্ড মানসিক চাপ হলে এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে (চিত্র মত) সজোরে চেপে ধরুন। তারপর ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের পিছনে এবং বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে ডান হাতের পিছনে চাপ দিন।

৩০	স্থূলতা	<p>ইহা তিন কারনে হয় :</p> <p>১। থাইরয়েড গ্রন্থি ঠিকভাবে কাজ না করলে</p> <p>২। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রসবের পর, জরায়ু অপারেশনের পর কম কাজ করলে।</p> <p>৩। অতিরিক্ত ভোজন বা দেহের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খাদ্য গ্রহণ করলে।</p>	<p>১। দিনে দুই বার সকল ৮নং বিন্দুতে গ্রন্থিতে চাপ দিন।</p> <p>২। গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর প্রতিটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে চাপ দিন।</p> <p>৩। সকালে এক গ্রাস হালকা গরম পানিতে অর্ধেকটা লেবু ও বড় এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন।</p> <p>৪। খাদ্য কমপক্ষে ১৫ বার চিবিয়ে খান।</p>
৩১	বদ অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়া	<p>ধূমপান, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্য পান ইত্যাদি বর্জন করার ইচ্ছা শক্তি অর্জন করা।</p>	<p>অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিসহ সবগুলি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিতে চাপ দিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে গেলে ১৫ দিনের মধ্যেই সমস্ত বদ অভ্যাসগুলি বর্জন করার মত ইচ্ছা শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। দেহে সব রকম প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।</p> <p>নেশার ইচ্ছা বেড়ে</p>

			গেলে গরম পানি পান করতে দিন।
৩২	উচ্চতা বৃদ্ধি	২০ বৎসর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের উচ্চতা বৃদ্ধি করা যায়।	১। ৩, ৮, ১১ থেকে ১৫, ২৫, ২৮ এবং ৩৮নং বিন্দুতে চাপ প্রয়োগ করুন। ২। প্রতিদিন ৭৫/ ১০০ গ্রাম অকুরিত মুগ/বুট খান। ৩। প্রতিদিন গাজর ও মধু মিশিয়ে কাচা সবুজ রস পান করুন।
৩৩	প্রতিবন্ধী	প্রতিবন্ধীদের প্রধানত সবগুলো অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিই বিকৃত থাকে। তাছাড়া এদের হার্ট, কিডনি, লিভার ও ফুসফুস ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত থাকে।	১। সকল অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিতে দিন তিন বার চাপ দিন। ২। নাভিচক্র বিকৃত থাকলে ঠিক করে নিন। ৩। ২২, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৬নং বিন্দুতে (যদি ব্যথা) থাকে চাপ দিন। ৪। স্বাস্থ্যকর পানীয় ১ চামচ এবং বড় এক চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন পান করতে দিন।
৩৪	কোষ্ঠ-কাঠিন্য	অন্ত্রগুচ্ছ ঠিক না থাকলে, লিভার যথেষ্ট	১। অন্ত্রগুচ্ছ ঠিক করে নিন।

		<p>পরিমান পিত্তরস উৎপন্ন না করলে কোষ্ঠ কাঠিন্য হয়। দীর্ঘ দিনের কোষ্ঠ কাঠিন্যের ফলে অশ্ব, মলদারে ক্যান্সার হতে পারে।</p>	<p>২। ১০-১২ দিন সকাল বেলা হরিতকির গুড়া এক কাপ পানর সাথে মিশিয়ে পান করুন।</p> <p>৩। খুতনীর নীচে বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা ২থেকে ৬ মিনিট ঘষতে বা চাপ দিতে হবে।</p> <p>৪। ১০ ও ২০ নং বিন্দুতে দিনে দু'বার চাপ দিন।</p> <p>৫। ক্রিমি থাকলে বের করে দিন।</p> <p>৬। অধিক মসলা ও ঝাল যুক্ত খাদ্য বর্জন করুন।</p>
৩৫	তোতলামী	<p>মেরুদণ্ডের গৃবাদেশীয় ৪ ও ৫নং অস্থি সন্ধি অবদমিত হলে তোতলামী হয়।</p>	<p>মেরুদণ্ডের ৯নং বিন্দুতে দুই মিনিট করে দিনে দুই বার চাপ দিতে হবে।</p>

আকুপ্রেসার বিন্দু পরিচিতি

- | | |
|--|--|
| ০১. মস্তিষ্ক (Brain) | ২১. এপেন্ডিক্স (Appendix) |
| ০২. মস্তিষ্কের স্নায়ু (Cranial nerves) | ২২. পিত্তথলি (Gall bladder) |
| ০৩. পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary gland) | ২৩. যকৃত (Liver) |
| ০৪. পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland) | ২৪. কাঁধ (Shoulder) |
| ০৫. মাথার শিরা (Head Veins) | ২৫. অগ্ন্যাশয় (Pancreas) |
| ০৬. গলা (Throat) | ২৬. বৃক্ক (Kidney) |
| ০৭. ঘাড় (Neck) | ২৭. পাকস্থলী (Stomach) |
| ০৮. থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি
(Thyroid & parathyroid gland) | ২৮. এড্রিনাল গ্রন্থি
(Adrenal glands) |
| ০৯. মেরুদণ্ড (Spinal column) | ২৯. নাভিচক্র
(Solar Plexus) |
| ১০. অর্শ (Piles) | ৩০. ফুসফুস (Lungs) |
| ১১. প্রোস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland) | ৩১. কান (Ear) |
| ১২. স্ত্রী ও পুরুষ যৌনাঙ্গ
(Vagina & penis) | ৩২. শক্তি (Energy) |
| ১৩. জরায়ু (Uterus) | ৩৩. কানের স্নায়ু
(Auditory nerve) |
| ১৪. ডিম্বাশয় (Ovaries) | ৩৪. ঠান্ডা (Cold) |
| ১৫. অভ্যকোশ (Testes) | ৩৫. চোখ (Eye) |
| ১৬. লসিকা গ্রন্থি (Lymph gland) | ৩৬. হৃৎপিণ্ড (Heart) |
| ১৭. নিতম্ব ও হাঁটু (Hip & knee) | ৩৭. প্লীহা (Spleen) |
| ১৮. মূত্রাশয় (Urinary bladder) | ৩৮. থাইমাস গ্রন্থি
(Thymus gland) |
| ১৯. ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine) | |
| ২০. মলাধার (Colon) | |

আকু-খোয়ানিপি • অধ্যাপক কে. এম. মোহরাস উদ্দিন

আকুপ্রেসার চিকিৎসা প্রয়োগের নিয়মাবলি

আকু-থের্যাপি

আপনার চিকিৎসা আপনি করুন

অধ্যাপক কে. এম. মেছবাহ উদ্দিন



আকুপ্রেসার ট্রেনিং এন্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টার

ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর